আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি

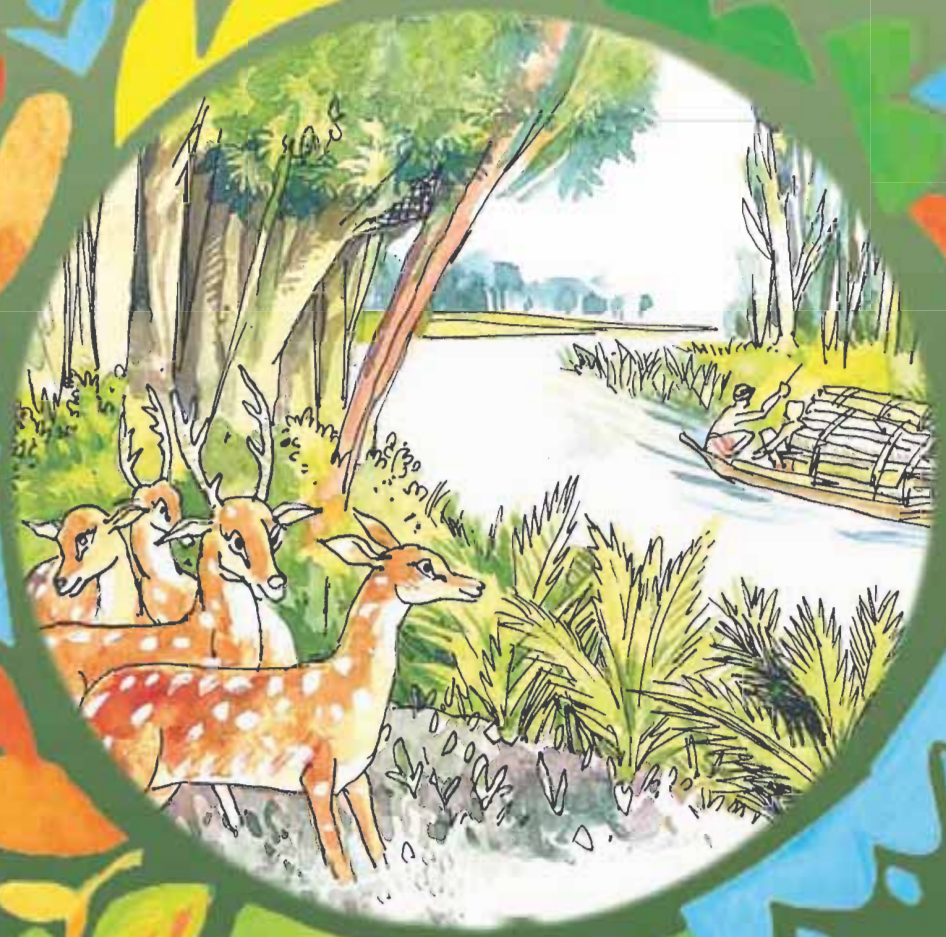

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

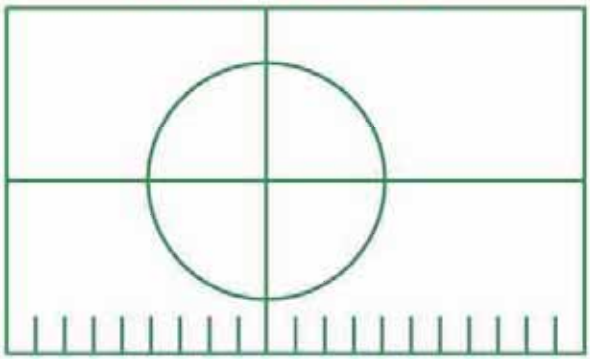

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' x $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি

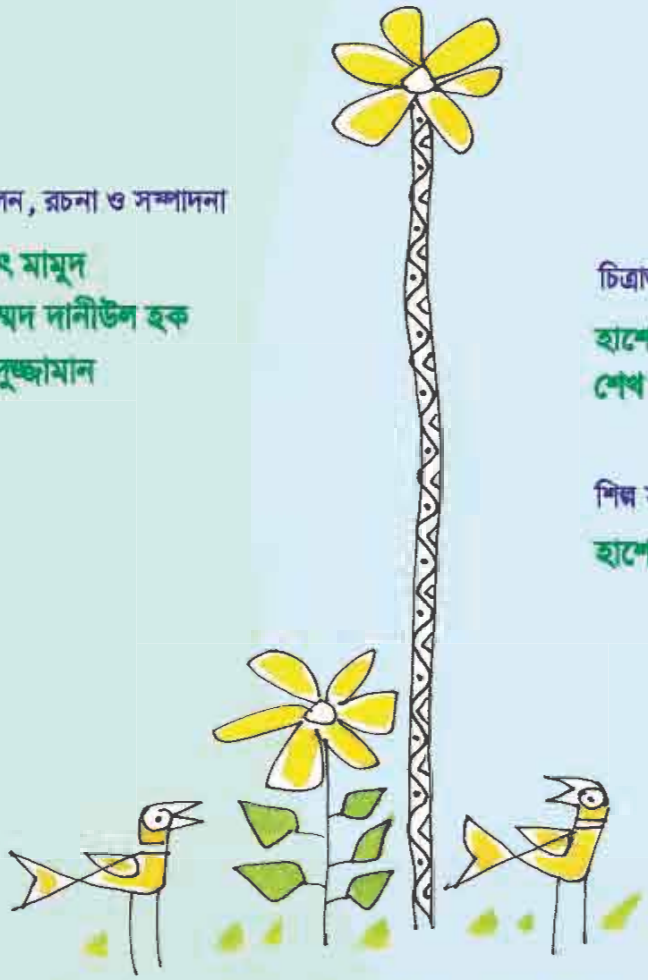

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

হায়াৎ মামুদ
মহাম্মদ দানীউল হক
মাসুদুজ্জামান

চিত্রাঙ্কন

হাশেম খান
শেখ আফজাল

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী

গ্রাফিক্স
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময় । তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই । শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী,দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ । শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম।এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা,বলা,পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করা ও নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশভিত্তিক এবং যুগের চাহিদার অনুকূল সহজ পাঠ প্রণয়ন করে সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে।পাঠকে যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয় পাঠের মাধ্যমে নিত্য-নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থী যেন তার শব্দভাণ্ডার ও ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকটিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	বাংলাদেশের প্রকৃতি	১
২	পালকির গান	৬
৩	বড় রাজা ছোট রাজা	৯
৪	মুক্তির ছড়া	১৪
৫	বাংলার খোকা	১৭
৬	আজকে আমার ছুটি চাই	২২
৭	বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা	২৬
৮	নেমন্তন্ন	৩৩
৯	মহীয়সী রোকেয়া	৩৬
১০	মোবাইল ফোন	৪১
১১	আবোল-তাবোল	৪৬
১২	হাত ধুয়ে নাও	৪৯
১৩	মোদের বাংলা ভাষা	৫৪
১৪	বাওয়ালিদের গল্প	৫৭
১৫	কাজলা দিদি	৬২
১৬	পাখির জগৎ	৬৬
১৭	বীরপুরুষ	৭২
১৮	পাঠান মুলুকে	৭৮
১৯	ঘুরে আসি সোনারগাঁও	৮২
২০	মা	৮৮
২১	পাহাড়পুর	৯২
২২	লিপির গল্প	৯৭

বাংলাদেশের প্রকৃতি

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বড় বড় ফোঁটায়, তবে ধীরে ধীরে। কখনো হুড়মুড় করে। কেউ যেন আকাশ থেকে বালতি উপুড় করে পানি ঢালছে। কখনো পড়ছে ঝিরঝির করে, খুব হালকা। এ ধরনের বৃষ্টির একটা নাম আছে। একে বলা হয় ইল্‌শেগুঁড়ি। আর বড় বড় ফোঁটায় প্রচুর বৃষ্টির নাম মুষলধারে বৃষ্টিপাত। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এমন বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির এই সময়টাকে বলে বর্ষাকাল। আমরা সবাই জানি, আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। এর অর্থ, প্রতি দু মাসে এক-একটা ঋতু। যেমন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস দুটো হলো গ্রীষ্মকাল। এরপর আষাঢ়-শ্রাবণ মিলে বর্ষাকাল। এভাবে ভাদ্র-আশ্বিন হচ্ছে শরৎকাল। তার পরে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস দুটি হেমন্তকালের। পৌষ আর মাঘ মাসের কথা তো আমরা সবাই জানি। তখন হাড়কাঁপানো শীত। রাত্রে লেপ কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমোতে হয়। দিনের বেলাতেও গায়ে চাদর জড়াতে হয়। একটা ছড়া আছে : মাঘ মাসের জাড়ে মোষের শিং নড়ে। জাড় মানে শীত। তা হলে ছড়ার অর্থ দাঁড়াল – মাঘ মাসে এমন শীত পড়ে যে সেই ঠান্ডায় মহিষের শিংও ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। এটা হচ্ছে শীতকালের একটা ছবি।

এরকমভাবে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত – এই ছয়টি ঋতুই প্রত্যেক বছর যাওয়া-আসা করে। বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। আমরা ষড় ঋতুর দেশের মানুষ। পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু দুটি মাসে এক-একটা ঋতু হয় না। অনেক দেশে দুটি ঋতু, কি তিনটি ঋতু দেখা যায়। খুব বেশি হলে, বড় জোর চারটি ঋতু। আমরা এ ব্যাপারে খুব ভাগ্যবান। প্রত্যেকটা ঋতুতে প্রকৃতি নতুন নতুন সাজপোশাক পরে। একেক সাজে তাকে নতুন মনে হয়, তার চেনা চেহারা অন্য রকম লাগে। গ্রীষ্মে কী গরম! অসহ্য রৌদ্রের তাপ। দুপুরে পথে বের হওয়া যায় না। বের যদি হতেই হয়, তখন মাথার ওপরে ছাতা ধরে লোকে হাঁটে।

বর্ষায় আবার একেবারে অন্য ধরনের চেহারা। আকাশে তখন মেঘের যে কী ছুটোছুটি খেলা! একটা মেঘ আরেকটা মেঘের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, হেসে একেবারে লুটোপুটি খাচ্ছে। তার রঙের বাহারও কী সুন্দর! খুব ঘন কালো, হালকা কালো, ছাইরঙা কালো, কালো কিন্তু তার চারদিকে হালকা রঙের পাড়। এই রকম কত যে রঙের আনন্দ! তারপর যেই শরৎ এলো অমনি সব পাল্টে যায়। বর্ষাকালে আকাশকে মনে হত মাটির কাছে নেমে এসেছে। শরৎ এলেই সেই একই আকাশ অনেক অ-নে-ক উঁচুতে উঠে যায়। তার গায়ের রং আর কালো থাকে না। সে হয়ে যায় ঘন নীল। শুধুই নীল নয়, কখনো কখনো তার গায়ে সাদা সাদা মেঘের ফুল ছিটিয়ে দেয় কে! এর পরেই চুপি চুপি পা ফেলে আসে হেমন্ত । হেমন্ত ভারি লাজুক ঋতু। সে এসে বলে – আমি শীতের খবর দিতে এসেছি, আমি চলে গেলেই সে আসবে। ভোরবেলায় ঘুমের মধ্যে শীত লাগে।

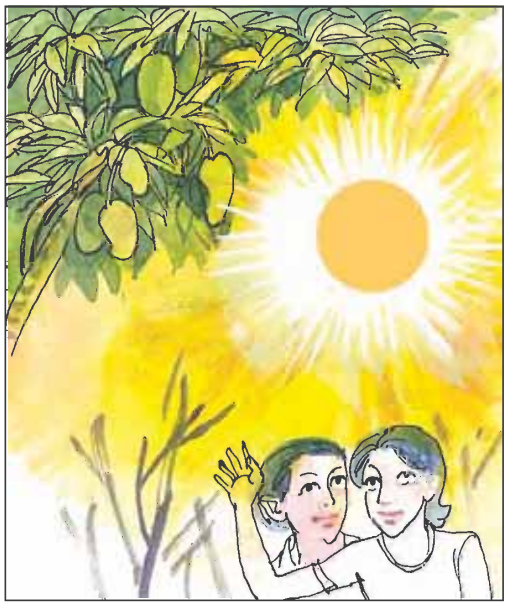

গ্রীষ্মকাল

বর্ষাকাল

শরৎকাল

হেমন্তকাল

শীতকাল

বসন্তকাল

তখন বুঝতে হয়, হেমন্ত এসেছে। আর শীত? শরীর হি-হি করে শিউরে উঠলেই সবাই বোঝে – গায়ে ঠান্ডা লাগছে। তার মানে, শীত পড়ছে। পৌষ আর মাঘ – এ দুটো মাসেই শীত ঋতু। যেই শেষ হলো এ ঋতু, অমনি বসন্তকাল। ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়। শীতকালে আসত উত্তুরে বাতাস। অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে আসত। এখন বসন্তের বাতাস – দখিন হাওয়া। দক্ষিণ দিক থেকে আসে। এ এমন এক বাতাস যাতে শরীর আরাম পায় আর মন খুশিতে ভরে যায়।

বাংলাদেশে এই যে ছয়টি ঋতু আসে-যায়, এ আমাদের বড় সৌভাগ্য। কারণ, পৃথিবী যে কত সুন্দর দেখতে, তা আমাদের মতো আর কোনো দেশের লোক জানতে পারে না।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি।

ইলশেগুঁড়ি – হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এ ধরনের বৃষ্টিতে নদীতে জাল ফেলে জেলেরা ইলিশ মাছ অনেক বেশি পায়। এ কারণেই এমন বৃষ্টির নাম ইলশেগুঁড়ি।

মুষল – মুগুর।

মুষলধারে বৃষ্টি – খুব বড় বড় ফোঁটায় যখন বৃষ্টি পড়ে। এত বড় ফোঁটা যেন মুগুর পড়ছে, মনে হয়।

বৃষ্টিপাত – বাদলের ধারা।

ষড়ঋতু – ছয়টি ঋতু : গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত।

বর্ষাকাল – বৃষ্টির কাল বা বৃষ্টির সময়।

অসহ্য – যা সহ্য করা বা সওয়া যায় না।

গ্রীষ্ম – গ্রীষ্মকাল, গরমের সময়। রোদ। সূর্যের ঝকঝকে আলো ও তাপ।

তাপ – উত্তাপ, গরম।

পাড় – কিনারা।

সৌভাগ্য – ভালো ভাগ্য, ভালো কপাল।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি।

(ক) বাংলাদেশে বৎসরে কয়টি ঋতু আসে-যায় ?

(খ) বছরের বারো মাসের নাম বল এবং লেখ।

(গ) কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন ঋতু ? বল এবং লেখ।

(ঘ) কোন ঋতু তোমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী ? লিখে জানাও।

(ঙ) তোমার দেখা বর্ষা ও শীত ঋতুর তুলনা কর।

৩. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) সে কারণেই আমরা ———— দেশের লোক। লাজুক
(খ) আকাশে তখন মেঘের যে কী ———— খেলা! উত্তুরে
(গ) আকাশকে মনে হত ———— কাছে নেমে এসেছে। ষড়ঋতুর
(ঘ) হেমন্ত ভারি ———— ঋতু। ছুটোছুটি
(ঙ) শীতকালে আসত ———— বাতাস। মাটির

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

যাওয়া	কালো
রঙের	ফুল
মোষের	আসা
ছাইরঙা	পাড়
মেঘের	শিং

৫. নিচের বাক্যগুলো পড়ি।

তখন হাড়কাঁপানো শীত।
অসহ্য রৌদ্রের তাপ।
ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়।
এ আমাদের বড় সৌভাগ্য।
হেমন্ত ভারি লাজুক ঋতু।

ওপরের বাক্যগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ খুঁজে বের করি। যেমন, ঋতু হলো দুইমাস নিয়ে সময়ের নাম, তাই এটি বিশেষ্য পদ। কিন্তু এই ঋতুর স্বভাব কেমন? – লাজুক। এটি হলো বিশেষণ পদ। বিশেষ্য পদের কোনো গুণ বা চরিত্র প্রকাশ করে যে শব্দ, সেটিই বিশেষণ। তাই 'ঋতু' বিশেষ্য পদের বিশেষণ হচ্ছে 'লাজুক'। সোজা কথায়, ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নাম হলেই তা বিশেষ্য। আর বিশেষ্যের অবস্থা বা গুণ প্রকাশ করে যে শব্দ তাকে বলে বিশেষণ।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পালকি চলে!
পালকি চলে!
গগন-তলে
আগুন জ্বলে!

স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি,
পাটায় বসে
ঢুলছে কষে।
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি,–
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।
আসছে কারা
হনহনিয়ে ?

হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো,–
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।

গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে;
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে।

পালকি চলে রে,
অঙ্গ টলে রে!
আর দেরি কত ?
আরও কত দূর ?

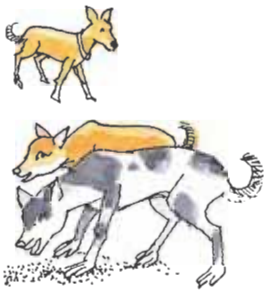

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

(ক) পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গায়। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি।

গগন – আকাশ। সকালে পূর্ব গগনে সূর্য উঠেছে।
আদুল – খালি গায়ে বা জামাকাপড় ছাড়া। শিশুরা বাড়ির উঠানে আদুল গায়ে খেলা করছে।
পাটা – তক্তা। পাটার উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছে।
ভনভনিয়ে – ভনভন শব্দ করে। কানের কাছে মশা ভনভনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।
কষে – জোরে। লোকটা কষে খুঁটিতে দড়ি বেঁধেছে।
হাটুরে – জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্যে যে হাটে যায়। হাটের শেষে হাটুরেরা ফিরছে।
ধুঁকছে – হাঁপাচ্ছে। দুপুরের রোদে ক্লান্ত কুকুরটা ধুঁকছে।
অঙ্গ – দেহ। সারাদিন কাজের শেষে চাষিদের অঙ্গ জুড়ে ক্লান্তি নামে।
স্তব্ধ – নীরব। স্যার এসে ঢোকা মাত্র ক্লাস স্তব্ধ হয়ে গেল।

৩. যুক্ত বর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তব্ধ	–	স্ত	=	স্+ত	–	ব্যস্ত , সস্তা
		ব্ধ	=	ব্+ধ	–	লব্ধ, ক্ষুব্ধ
রৌদ্র	–	দ্র	=	দ্+র	–	নিদ্রা, ভদ্র
ক্লান্ত	–	ক্ল	=	ক্+ল	–	ক্লাস, ক্লেশ (কষ্ট)
		ন্ত	=	ন্+ত	–	শান্ত , পান্তা
অঙ্গ	–	ঙ্গ	=	ঙ্+গ	–	সঙ্গ, রঙ্গ

৪. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি।

ভনভন, হনহন, শনশন, ঝমঝম, খকখক, পিলপিল

(ক) পথিক চলে ———— করে।

(খ) ———— করে মাছি ওড়ে।

(গ) বাতাস বয় ———————— করে।
(ঘ) ———————— করে বৃষ্টি পড়ে।
(ঙ) পিঁপড়ে ———————— করে চলে।
(চ) লোকটি ———————— করে কাশে।

৫ . প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে ?
(খ) পাটায় বসে ময়রা কী করছে ?
(গ) হাটুরে কোথায় যাচ্ছে ?
(ঘ) কুকুরগুলো ধুঁকছে কেন ?
(ঙ) গঙ্গা ফড়িং কী করছে ?

৬. বই দেখে ছড়াটির ছন্দ ঠিক রেখে স্বাভাবিক গতিতে ও প্রমিত উচ্চারণে বারবার পড়ি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

"পালকির গান" কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।

কবি পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের কারুকাজ, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। "পালকির গান" কবিতাটি 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বড় রাজা ছোট রাজা

দুই রাজা থাকেন – বড় রাজা আর ছোট রাজা। দু-জনে একদিন দিগ্‌বিজয় করতে চললেন। বড় রাজা চললেন বড় বড় হাতি ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে, মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে, বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে, বড় বড় রাজ্য জয় করতে করতে।

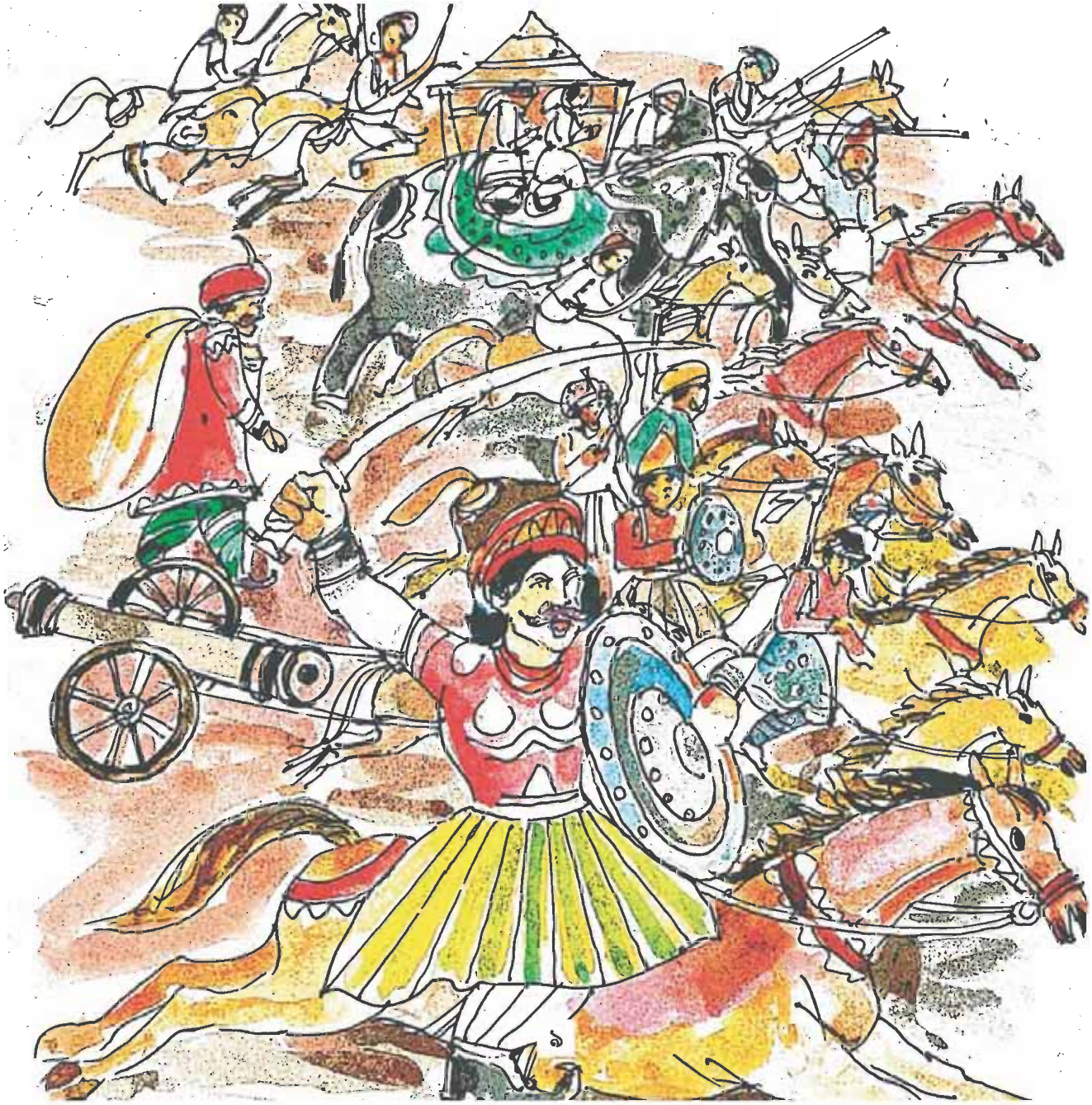

এদিকে ছোট রাজা, তিনি চললেন সাধারণ মানুষজনের সাজে, ছোট ছোট খেলবার কামান বন্দুক হাতি ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পুঁটলি বেঁধে, ছোট রাজ্য জয় করতে – বড় রাজার পিছনে পিছনে।

মস্ত বড় এই পৃথিবী – বড় রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন। এমন সময় চর এসে খবর দিল, 'মহারাজ, শুনে এলাম, ছোট রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছেন।' বড় রাজা বললেন, 'তাকে গিয়ে বলো, আমি এই পৃথিবীটা জয় করে নিয়েছি, সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।'

দূত গেল ছোট রাজার কাছে। কিন্তু ছোট রাজার সে রাজ্য এত ছোট যে দূত দেখতেই পেল না কোথায়-বা রাজা, কোথায়-বা রাজত্ব। সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিল – চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব; সেখানে প্রবেশ করা ভারি কঠিন।

বড় রাজা বড়ই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চলো আমি নিজে যাব।'

বড় রাজা মস্ত মস্ত হাতি-ঘোড়া, রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোট শহর এতটাই ছোট যে সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিল – সবাই চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো!

সেনাপতি বললেন, 'এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।'
রাজা বললেন, 'দেখাই যাক না।'

যুদ্ধ বাধল – সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোট রাজার ফৌজ গলে পালাল। তীর-কামান আন্দাজ করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকল, নয়তো আকাশে ঝুপঝাপ বড় রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড় বড় অস্তর – সেসব অস্ত্র বড় জিনিসকেই লক্ষ করে, ছোটকে দেখতে পায় না। বড় রাজা, বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে গিয়ে ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোট রাজা হেসে বললেন, 'দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকো। ছোটতে-বড়তে সন্ধি হলে কী হয় তা জানো না কি ?'

বড় রাজা বললেন, 'তা কি আর জানিনে ?

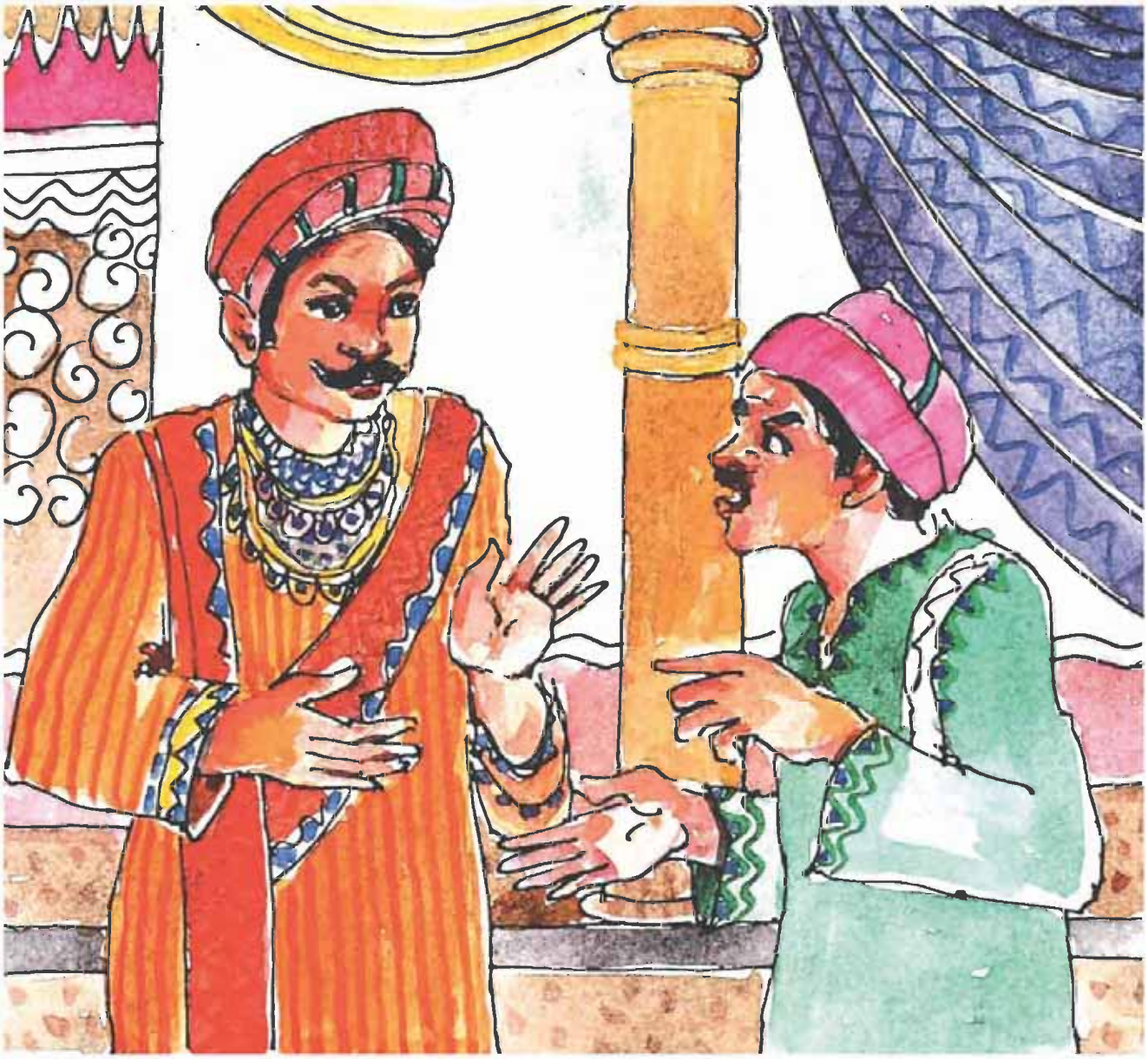

সেনাপতি বললেন, ‘এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড় রাজা, ওইটুকু আর জানেন না ?’

ছোট রাজা বললেন, ‘তাহলে এবারকার মতো এতটুকু জেনেই ঘরে যান সকলে। আরও কী জানতে চান ?’

বড় রাজা রেগে বললেন, 'ছোটকে টুঁটি চেপে ধরলে কী করে তাই জানাতে চাই' বলেই বড় রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় ছোট রাজা, এমনকি তাঁর রাজত্বটা পর্যন্ত কষে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায়, তেমনি বড় রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছোট রাজা, তার রাজসিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড় রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি; বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড় রাজার আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল ।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগ্‌বিজয় – চারদিকের নানান জায়গা জয় করা।
সেনাপতি – সেনাদলের প্রধান, প্রধান সৈনিক।
রাজত্ব – রাজার শাসন যেখানে চালু আছে।
জয়ঢাক – জয়ী হওয়ার পর যে ঢাক (একধরনের বাদ্য) বাজানো হয়।
চর – গোপন খবর সংগ্রহ করে দেন যিনি। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এই চর নিয়োগ করা হয়।
দূত – বার্তাবাহক।
অগোচর – চোখের আড়ালে থাকা।
খাপ্পা – রাগান্বিত হওয়া।
মন্ত্রণা – পরামর্শ।
অণুবীক্ষণ – চোখে দেখা যায় না এরকম জিনিস দেখার যন্ত্র ।
ফৌজ – সৈনিক।
অস্তর – অস্ত্র ।
সন্ধি – বন্ধুত্ব।

২. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ শিখি।

চর – দূত।
চর – নদীর চর।
চলা – পায়ে হাঁটা।
চলা – চালিত হওয়া।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) বড় রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন ?
(খ) বড় রাজা ছোট রাজার উপর রেগে গেলেন কেন ?
(গ) বড় রাজা কেন ছোট রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না ?
(ঘ) বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন ?
(ঙ) বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ ? কেন ?

৪. অল্প কথায় গল্পটা বলি।

৫. কর্ম-অনুশীলন।

'শক্তি থেকে বুদ্ধির জোর বেশি' বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

মুক্তির ছড়া

সানাউল হক

তোমার বাংলা আমার বাংলা
সোনার বাংলাদেশ –

সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি
রূপের নেই তো শেষ।

আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা,
নবীন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া।

এদেশ আমার এদেশ তোমার
সবিশেষ মুজিবের,

হয়ত অধিক মুক্তিপাগল
সহস্র শহিদের।

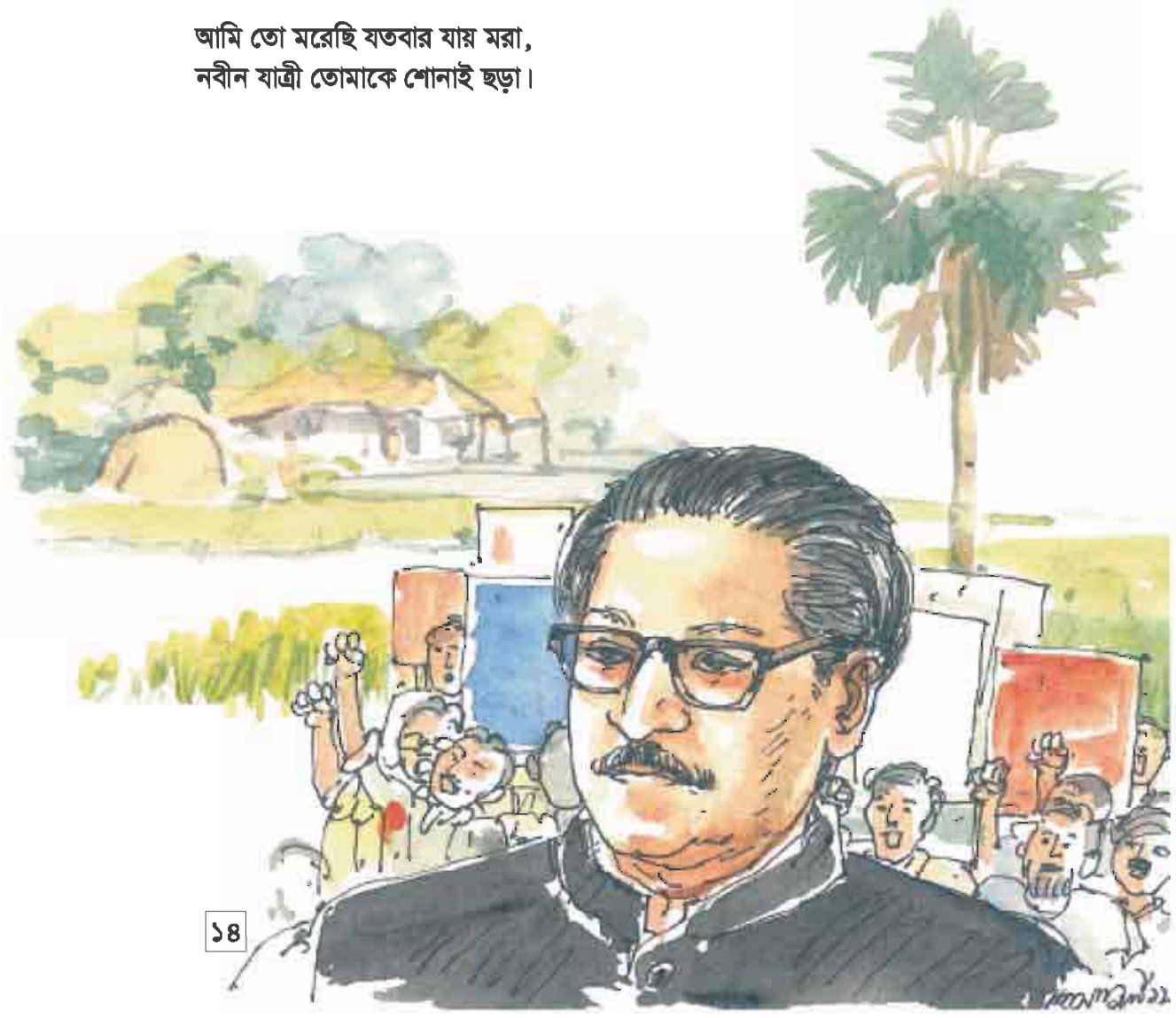

পাঠ শিখি

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সোনার বাংলাদেশ – প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ ছিল একসময় প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলে সোনার বাংলা। আমরা আবার সোনার বাংলাদেশ গড়ব।

সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি – বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রুপালি ইলিশ।

যতবার যায় মরা – বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বারবার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বারবার এসেছে।

নবীন যাত্রী – যারা নতুন যুগের শিশু। আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্বপ্ন।

সবিশেষ মুজিবের – এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।

মুক্তিপাগল – এ দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।

সহস্র শহিদের – মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলি কেন ?

(খ) এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই ?

(গ) 'আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।' – বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

(ঘ) নবীন যাত্রী কারা ?

(ঙ) এ দেশ সবার অধিক যে মুক্তিপাগলদের, সেই মুক্তিপাগল কারা ?

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

শেষ	–	শুরু
মরা	–	বাঁচা
নবীন	–	প্রবীণ
মুক্তি	–	বন্দি

৪. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি লিখি।

ক) _____ _____ ফিরোজা রুপালি
রূপের নেই তো _____

খ) _____ _____ তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ) এদেশ _____ এদেশ _____
সবিশেষ _____

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৬. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করি।

কবি পরিচিতি

সানাউল হক

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাউড়ায়। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে তিনি সরকারি প্রশাসনে যোগ দেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলার খোকা

মমতাজউদ্দিন আহমেদ

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। দিনটি ছিল বুধবার।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়াতে শেখ পরিবারে জন্ম হলো একটি শিশুর। বাবা শেখ লুৎফর রহমান আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা। খোকা খুব আদরের নাম। বাংলার প্রায় সব ঘরেই প্রথম পুত্রসন্তান হলে নাম রাখা হয় খোকা।

দিনে দিনে বড় হয় খোকা। গায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। দুচোখ মেলে দেখে বাংলার মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, সোনালি ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

যত বড় হয় খোকা তত তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে। ক্লাসের বন্ধুদের বাইরেও গাঁয়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড় হয়। প্রায়ই বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে এসে বলে, 'মা, ওদের খেতে দাও। আমার বন্ধু গোপালের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি।' মা আনন্দের সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসিমুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন।

বর্ষাকালে স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় বলে বাবা খোকাকে ছাতা কিনে দিলেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন ছাতা ছাড়া ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল খোকা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর ছাতা কই বাবা? এমন ভিজেছিস কেন?'

খোকা হাসিমুখে বলল, 'মাগো, আমার এক গরিব বন্ধুর ছাতা নেই। আমার ছাতাটা ওকে দিয়েছি।'

মা ছেলের এমন উদারতায় মুগ্ধ হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভালোই করেছিস বাবা! তোর বাবাকে বলব তোকে আর একটা ছাতা কিনে দিতে।'

মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন।

শীতের সময় খোকাকে একটা চাদর কিনে দেওয়া হলো। একদিন দেখা গেল চাদর ছাড়াই বাড়ি ফিরে এলো খোকা। মা বললেন, 'তোর চাদর কই বাবা?' খোকা বুক ফুলিয়ে বলে, 'মা গো, পথের ধারে গাছের নিচে এক গরিব বুড়ি শীতে খুব কাঁপছিল। আমি তার গায়ে চাদরটি জড়িয়ে দিয়ে এসেছি।'

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, গরিব মানুষের জন্য ছেলেটির এত দরদ! ও নিশ্চয় বড় হয়ে মানুষের জন্য অনেক কিছু করবে।

খোকার খেলার সাথী জেলের ছেলে গোপাল করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। খোকা বন্ধুকে বলে, 'তোর বাঁশির সুরে আনন্দ নেই কেন রে গোপাল?'

গোপাল হতাশ হয়ে বলে, 'আমার চারদিকের মানুষের জীবনে আনন্দ নেই রে খোকা।'

খোকা নিশ্চুপ থেকে ভাবে, তাই তো। আমার চারদিকে এমন অবস্থাই তো দেখতে পাই। এই অবস্থা বদলাতে হবে। দেশের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড় হয় খোকা। স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢোকে। বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরও বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার।

এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

(২০১২ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণির আমার বাংলা বই থেকে গৃহীত)

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি।

নিবিড় – গভীর। নিবিড় ভালোবাসার জন্যই গ্রামে যেতে ইচ্ছে করে।
আবদার – বায়না, অন্যায় দাবি। ছেলের আবদার শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।
উদারতা – সরলতা। উদারতা মানুষকে মহান করে।
মুগ্ধ – আত্মহারা, বিভোর। নাটকটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।
দরদ – মমতা, টান। ছোট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক দরদ।
করুণ – কাতর, বেদনাপূর্ণ। বাস দুর্ঘটনার করুণ দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।
হতাশ – আশাহীন, নিরাশ। সামান্য কারণেই হতাশ হওয়া ঠিক নয়।
মহকুমা – প্রশাসনিক এলাকা। আগে কয়েকটি মহকুমা মিলে জেলা গঠিত হতো। গোপালগঞ্জ আগে মহকুমা ছিল, এখন জেলা হয়েছে।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়েছিল ?
(খ) বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করেছিল ?
(গ) বুড়িটি কোথায় শীতে কাঁপছিল ?
(ঘ) খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল কেন ?
(ঙ) কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন ?

৩. ডান দিক থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

(ক) আদর করে ———— নাম রাখলেন খোকা। — গরিব
(খ) মা হাসিমুখে ছেলের ———— পূরণ করেন। — ছেলেটির
(গ) ভাবেন, ———— মানুষের জন্য ———— এত দরদ। — দেশের কথা
(ঘ) বাংলার মানুষের কথা, ———— ———— তাঁকে নিয়ত ভাবায়। — আবদার
(ঙ) এই খোকা আমাদের ———— । — বঙ্গবন্ধু
শিশুর

৪. বাক্য গঠন করি।

আদর, সোনালি, কপাল, চাদর, গরিব, আনন্দ, নিশ্চুপ, চৌকাঠ, রাজনীতি, জনক।

৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন – এমন তিনটি উদাহরণ খাতায় লিখি।

৬. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু	————
আনন্দ	————
ভেজা	————
গরিব	————
নিচে	————
দুঃখ	————
স্বাধীনতা	————

৭. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ চিনে নিই।

বিশেষ্য	বিশেষণ
ঘর	বড়
স্কুল	সোনালি
ছাতা	গরিব
চাদর	উদার
গাছ	মুগ্ধ
বাঁশি	করুণ
চৌকাঠ	হতাশ

৮. কর্ম-অনুশীলন।

বঙ্গবন্ধু যেমন গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি আমি নিজে গরিব মানুষের জন্য কী করতে পারি লিখে জানাই।

লেখক পরিচিতি

মমতাজউদ্দিন আহমেদ

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে : 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আজকে আমার ছুটি চাই

শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মার কাজে সাহায্য করে। ওর বোনটা অনেক ছোট বলে ওর সাথেও খেলাধুলা করে। শাহীন কিন্তু নিয়মিত স্কুলে যায়। সেদিন স্কুলে যাওয়ায় সমস্যা হয়ে গেল। বাবা দূরে গেছেন কাজে। পরের দিন সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না। এদিকে বোনটার অসুখ করল। এমন অবস্থায় শাহীন স্কুলে যায় কী করে?

শাহীন দুটো চিঠি লিখল। একটা চিঠি তার ক্লাসের বন্ধু পাশের গ্রামের শেখরকে, অন্যটা তার ক্লাসের স্যারকে। শাহীনের চিঠিটা স্যারকে পৌঁছে দেবে শেখর।

১ম চিঠিটা এই রকম :

সফেদপুর
১১.০২. ১৪১৯ সন

প্রিয় বন্ধু শেখর,
আমি আজ স্কুলে যেতে পারব না। আমার ছোট বোনটার অসুখ করেছে। আর বাবাও বাড়ি নেই; কাল সন্ধ্যায় আসবেন। বাজারে যাওয়ার সময় সমির চাচা তোমাকে লেখা আমার চিঠিটা দেবেন। তুমি ওটা লতিফ স্যারকে দেবে আর আমার কথা বলবে। দিনের সব পড়া ভালো করে দেখবে ও লিখবে। বাবা বাড়ি এলে তোমার কাছ থেকে আমি পড়া দেখে নেব। তোমার গল্পের বইটাও তখন নিয়ে আসব।

আজকে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে খেলার বইটা নিতে ভুলবে না যেন।

ইতি
তোমার বন্ধু
শাহীন

বন্ধু শেখরকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে অপর পৃষ্ঠায় শাহীন লিখল :

শেখরচন্দ্র দে
গ্রাম : আড়াইপাড়
(উত্তর পাড়া)

২য় চিঠিটা এই রকম :

শ্রেণি শিক্ষক
৪র্থ শ্রেণি
ইছাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম নেবেন। আজ আমি স্কুলে আসতে পারছি না। আমার ছোট বোনের অসুখ করেছে। আর বাবাও বাড়ি নেই, কাল আসবেন।

তাই দয়া করে আজকে আমাকে ছুটি দেবেন। আমি সব পড়া শিখে কাল আসব। তার পরের দিন খেলায়ও থাকব।

ইতি –
আপনাদের ছাত্র
শাহীন রহমান
৪র্থ শ্রেণি, ক্রমিক নম্বর - ০২

সফেদপুর
১১.০২.১৪১৯ সন

স্যারকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে ভরল শাহীন।

খামের বাম পাশে লিখল :	খামের ডান পাশে লিখল :
প্রেরক	প্রাপক :
শাহীন রহমান	জনাব লতিফ আহমদ খন্দকার
৪র্থ শ্রেণি	শ্রেণি শিক্ষক, ৪র্থ শ্রেণি
পিতা : বদিউর রহমান	ইছাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম : সফেদপুর	ইছাপুর
জেলা : ঢাকা	ঢাকা
পোস্টকোড : ১৩৪৫	পোস্টকোড : ১৩৪৪

শাহীনের প্রথম চিঠিটা পেয়ে শেখর সব কিছু ঠিক মতোই করেছিল। আর স্যারকে লেখা চিঠিটা পেয়ে তার শিক্ষক লতিফ সাহেবও ঠিকই জেনে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তিনি তার চিঠিটার গায়ে ছুটির কথা লিখে দিয়ে সই করলেন এবং প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিলেন। শেখরকেও জানিয়ে দিলেন যে, শাহীনকে এক দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রয়োজনে এই রকম চিঠি লিখে জরুরি কাজ ও সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি। চিঠি লেখার অভ্যাস করতে হয় এবং জানতে হয় কোন চিঠি কখন, কাকে এবং কীভাবে লিখতে হয়।

পাঠ শিখি

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিখি।

(ক) শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল ?
(খ) কাকে কাকে চিঠি লিখতে হয়েছিল শাহীনকে ?
(গ) বন্ধুকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল ?
(ঘ) চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল ?
(ঙ) চিঠিতে সাধারণত কী কী অংশ থাকে ?

২. জেনে নিই।

(ক) চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন – ব্যক্তিগত, পারিবারিক, নিমন্ত্রণ, ব্যবসা বিষয়ে, দাপ্তরিক, অনুরোধ বা আবেদন ইত্যাদি।
(খ) পত্রের মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন –

(১) যেখান থেকে পত্র লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ
(২) সম্বোধন বা সম্ভাষণ
(৩) মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)
(৪) বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)
(৫) পত্রপ্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাক্ষর ও ঠিকানা
(৬) প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা
(গ) চিঠি চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ ——————। দ্বিতীয় অংশ ——————।
তৃতীয় অংশ ——————। চতুর্থ অংশ ——————। পঞ্চম অংশ —————— ষষ্ঠ অংশ ——————।

৪. পত্র লিখি।

(ক) ছোট কাকার কাছে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখি।
(খ) পাশের স্কুলের সঙ্গে হাডুডু খেলা দেখার জন্য ছুটি চেয়ে আবেদনপত্র লিখি।

বিষয়	প্রাপক	
সম্বোধন	নাম	:
মূল বক্তব্য	ঠিকানা	:
ইতি টানা	ডাকঘর	:
স্বাক্ষর	জেলা	:
প্রেরকের পোস্টকোড	পোস্টকোড	:

৫. লিখলো, দেবে, করছে, দেখবে, আসবো, পারছি, লিখবো, করলেন, জানতে – এগুলো সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, যার দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়।

বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা

শেষরাত, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। মহানন্দা পাড়ি দিয়ে শত্রুশিবিরের দিকে ক্রলিং করে এগিয়ে যাচ্ছেন এক তরুণ। কাছাকাছি গিয়ে শত্রুর বাঙ্কার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন একটা গ্রেনেড। মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ঐ বাঙ্কার। কিন্তু অন্য বাঙ্কার থেকে একটা গুলি এসে লাগল তার দেহে। তিনি শহিদ হলেন। বীরের রক্তে রঞ্জিত হলো বাংলাদেশের মাটি। স্বাধীনতার জন্যে এভাবেই সেদিন অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

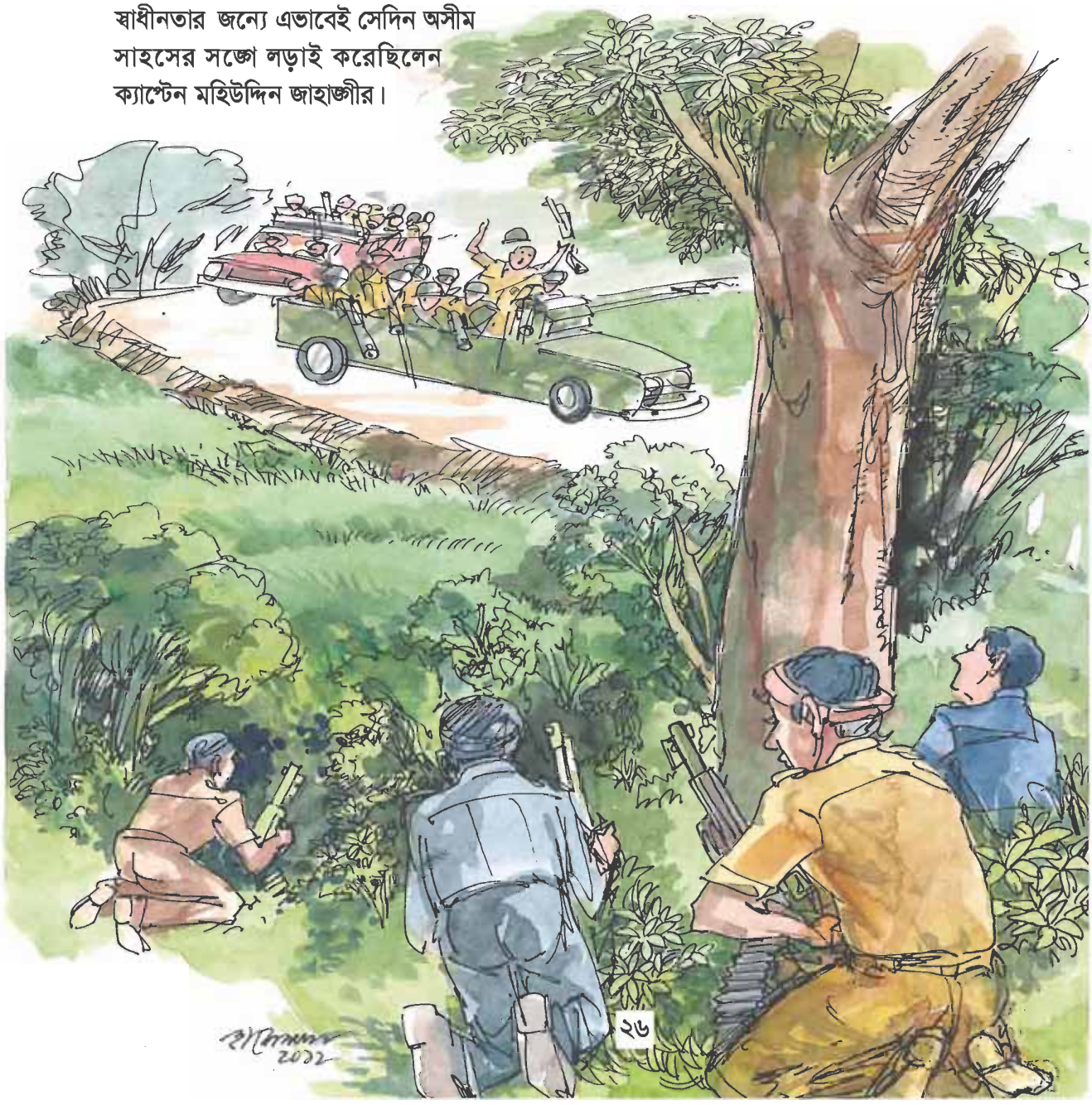

অবিস্মরণীয় সেই সময় ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বাধীনতার মরণপণ সংগ্রামে। সারা বাংলাদেশ তখন রণক্ষেত্র। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে যেভাবেই হোক পরাজিত করতে হবে। শত্রুমুক্ত করতে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ তাহলে অর্জন করবে স্বাধীনতা। কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক – যোগ দিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে। এঁদের মধ্যে জীবন বাজি রেখে সেদিন যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁরাই বীরশ্রেষ্ঠ – মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহম্মদ রুহুল আমিন, মতিউর রহমান, মুন্সী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৯৪৮ সালে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহিমগঞ্জে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাকোরামে। সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুসারে ছুটি নিলেন কয়েক দিনের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে পৌঁছালেন ভারতে। ভারতে পৌঁছে মালদহ জেলার মেহদিপুরে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হবার দুদিন আগে মহানন্দার সেই যুদ্ধে বীরের মতো তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট। করাচির মাশরুর বিমানঘাঁটি থেকে টি–৩৩ বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন। সঙ্গে পাকিস্তানি বৈমানিক

আমার বাংলা বই

মিনহাজ রশিদ। বিমানটি তখন শূন্যে, আকাশপথে। মতিউর পরিকল্পনা অনুসারে নিজেই বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলেন। বিমানটি কব্জা করা নিয়ে মিনহাজের সঙ্গে বিমানের মধ্যেই ধস্তাধস্তি হলো। বিমানটি থাট্টায় বিধ্বস্ত হলো। ভারতীয় সীমান্ত থেকে থাট্টার দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। বিধ্বস্ত এলাকাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল মতিউরের প্রাণহীন দেহ। পরে তাঁকে মাশরুরে কবর দেওয়া হয়। তিরিশ বছর ধরে পাকিস্তানের মাটিতে শায়িত ছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় ঢাকার শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থলে।

মতিউর রহমান

মতিউর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকায়, ১৯৪১ সালে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তিনি ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

মুক্তিযুদ্ধের আরেক অসীম সাহসী যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। ১৯৫২ সালের ২রা ফ্রেব্রুয়ারি তিনি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খর্দ খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃসাহসিক এক যুদ্ধে জীবন দিয়েছিলেন তিনি। ভারতের ত্রিপুরায় তাঁকে প্রথম সমাহিত করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৮শে অক্টোবর। শ্রীমঙ্গল থানার ধলাই সীমান্ত ফাঁড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিলেন গুরুত্বপূর্ণ এই ফাঁড়িটি দখল করতে হবে। দায়িত্ব অর্পিত হলো প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। নেতৃত্ব দেবেন সিপাই হামিদুর রহমান। তিন প্লাটুন সৈনিক নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। রাতের আঁধারে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে থাকলেন শত্রু শিবিরের দিকে। একেবারে কাছে এসে গেছেন তারা। গ্রেনেড ছুঁড়ে শত্রুর বাঙ্কার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু তখনই মাটিতে পেতে রাখা একটা মাইন বিস্ফোরিত হলো। পাকিস্তানি সেনারা সতর্ক হয়ে গেল। দুই পক্ষে বেধে গেল তুমুল যুদ্ধ। হামিদুর লক্ষ করলেন দুজন শত্রুসেনা এলএমজি

হামিদুর রহমান

থেকে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ছে। মুক্তিযোদ্ধারা এজন্যে এগুতে পারছেন না। হামিদুর নিঃশব্দে ক্রলিং করে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে একটা রাইফেল আর দুটো গ্রেনেড। নির্ভুল নিশানায় প্রথম গ্রেনেডটা ছুঁড়লেন হামিদুর। দ্বিতীয় গ্রেনেডটাও ঠিক লক্ষেই বিস্ফোরিত হলো। শত্রুর আক্রমণকে স্তব্ধ করে দিলেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিলেন ঐ ঘাঁটি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছোঁড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে। শহিদ হলেন এই অকুতোভয় বীর। হামিদুরকে এরপর ত্রিপুরার কমলপুর থানার আমবাসা গ্রামে সমাহিত করা হয়। ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয় বাংলাদেশে। পরদিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে পুনরায় সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৭ বছর ৪ মাস।

তিন বীরশ্রেষ্ঠ, এক মহান বীরগাথার অনুপম রচয়িতা তাঁরা। তাঁদের মতো অনেকের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন উৎসর্গ করতে হয় – এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেছেন তাঁরা।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও নিজে নিজে বাক্য গঠন করি।

বীরশ্রেষ্ঠ – বীরত্বে সবার সেরা।

বাঙ্কার – যুদ্ধের জন্য তৈরি করা মাটির গর্ত। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে শিবির গাহারা দেয় বা যুদ্ধ করে।

ক্রলিং – যুদ্ধকালে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

ধূলিসাৎ – চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া।
আহ্বান – ডাকা।
রণক্ষেত্র – যুদ্ধের স্থান।
মুক্তিবাহিনী – বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের বাহিনী।
পরিকল্পনা – কোনো কাজ করার আগে কাজটা কীভাবে করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া।
নিয়ন্ত্রণ – দাওয়াত দেওয়া।
অতিক্রম – কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাড়িয়ে যাওয়া।
বিধ্বস্ত হওয়া – ভেঙেচুরে যাওয়া।
দুঃসাহসিক – অত্যন্ত সাহসের কাজ।
সন্তর্পণে – সাবধানে, চুপি চুপি।
বিস্ফোরণ – চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে পড়া।
মেশিনগান – যুদ্ধে ব্যবহৃত বন্দুকের মতো অস্ত্র।
অকুতোভয় – ভয় নেই যার।
বীরগাথা – বীরের গল্প।
অনুপম – অতুলনীয় সুন্দর।
এলএমজি – Light Machine Gun – হালকা মেশিন গান। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি।

(ক) বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন ?
(খ) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন – বর্ণনা কর।
(গ) যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের জীবনে কী ঘটেছিল ?
(ঘ) কে ধলাই সীমান্ত ফাঁড়ি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?
(ঙ) বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দাও।
(চ) স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন উৎসর্গ করতে হয় – ব্যাখ্যা কর।

৩. আমার জানা মুক্তিযুদ্ধের একটা সত্যি ঘটনা বা গল্প বলি।

৪. তারিখবাচক শব্দ শিখি।

লেখাটিতে আছে '১৯৫২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি' – এখানে ব্যবহৃত '২রা' শব্দটিকে বলা হয় তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত লিখতে হয় এইভাবে :

১লা	(পহেলা)	৬ই	(ছয়ই)
২রা	(দোসরা)	৭ই	(সাতই)
৩রা	(তেসরা)	৮ই	(আটই)
৪ঠা	(চৌঠা)	৯ই	(নয়ই)
৫ই	(পাঁচই)	১০ই	(দশই)

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

(ক) বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ?

(১) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
(২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(৩) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি
(৪) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

(খ) বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন ?

(১) মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন
(২) ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন
(৩) গ্রেনেড ছুঁড়েছিলেন
(৪) বিমান আক্রমণ করছিলেন

(গ) বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান কেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন ?

(১) মুক্তিযোদ্ধারা এগুতে পারছিলেন না
(২) শত্রুর গোলাবারুদ দখল করতে চাইছিলেন
(৩) আহত সহযোদ্ধাদের উদ্ধার করছিলেন
(৪) নিজেদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসছিল

আমার বাংলা বই

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাচ্ছ কোথা ?
চাখড়িপোতা।
কিসের জন্য ?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি ?
না, বাবুজি।
কিসের তবে ?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন ?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও ?
ছানার পোলাও।

ইচ্ছে কী আর ?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি ?
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই ?
না, মশাই।

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

এই কবিতাটিতে আসলে একটা হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চাংড়িপোতা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল – ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে তাকে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয় – এই ভয়।

২. নিচের শব্দার্থগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

ভজন	–	এক ধরনের গান। এ ধরনের গানে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা হয়।
প্রসাদ ভোজন	–	(গান শোনার কারণে) আশীর্বাদ বা দোয়া হিসেবে খাওয়াদাওয়া।
সাধ	–	ইচ্ছা।
সরপুরিয়া	–	দুধের সর দিয়ে তৈরি এক রকম মিষ্টি।
আয়েস	–	আরাম, তৃপ্তি।
রাবড়ি	–	খুবই মিষ্টি এক রকমের খাবার।
ক্ষীর	–	দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন।
কদলী	–	কলা।
ফলার	–	কলা ও অন্যান্য ফলমূল মিশিয়ে তৈরি করা খাবার।
ফজলি আম	–	খুবই সুগন্ধ ও মিষ্টি স্বাদের আম।
সবরি কলা	–	এক রকম কলার নাম।
তরে	–	জন্যে, কারণে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) লোকটি নেমন্তন্ন খেতে কোথায় যাচ্ছে ?
(খ) চাংড়িপোতা সে কেন যাচ্ছে ?
(গ) কোন খাবার সে আয়েস করে খেতে চায় ?
(ঘ) লোকটি কোন কোন ফল খেতে চায় ?
(ঙ) সে কোন আম খেতে চাইছে ?
(চ) ছানার পোলাও কী দিয়ে তৈরি হয় ?

৪. লোকটি কী কী খেতে চাইছে তা লিখে জানাও।

৫. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

নেমন্তন্ন – নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।
সাধ – ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা
বিয়ে – বিবাহ, পরিণয়, শাদি।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কবিতাটি পড়ি ও বিরাম চিহ্ন বজায় রেখে লিখি।

লেখক পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ডেঙ্কানাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে ১৯২৬ তিনি সালে প্রশিক্ষণের জন্য বিলাত যান। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার, প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পথে প্রবাসে', 'বিনুর বই', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের খৈ' প্রভৃতি। অন্নদাশঙ্কর রায় ২০০২ সালের ২রা অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

মহীয়সী রোকেয়া

সে অনেক কাল আগের কথা। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। সেই গ্রামেই পায়রার পালকের মতো কোমল মনের এক শিশুর জন্ম হলো। নাম তার রোকেয়া। রোকেয়ার দুই বোন আর দুই ভাই। বাবা জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারি তখন পড়তির দিকে। তবে বনেদি ঠাট, হালচাল, সবই আছে। রোকেয়ার সকালে ঘুম ভাঙে ঘুঘুর ডাকে। কখনো বৌ কথা কও পাখির কথায় মনটা খুশিতে ভরে ওঠে, কখনো বিষণ্ন। বিষণ্ন, কেননা পাখিদের তো ডানা আছে। পাখিরা উড়তে পারে। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু রোকেয়ার কোথাও যাবার অনুমতি নেই। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, কারো সামনে যাওয়াও নিষেধ। এমনকি সে যদি মেয়ে হয়, তার সামনেও নয়।

একবার হলো কী, কয়েকজন মেয়ে-আত্মীয় রোকেয়াদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। রোকেয়ার বয়স তখন পাঁচ বছর। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রোকেয়ার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তাকে কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হলো। তক্তপোষের নিচে, এমনকি রান্নাঘরের ঝাঁপের আড়ালেও লুকাতে হয়েছে তাকে। এ নিয়ে পান থেকে চুন খসলেই শুনতে হতো গঞ্জনা। কারো সামনে – সে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে – আসাই ছিল নিষিদ্ধ। মেয়েদের যে এভাবে চলতে হতো, একেই বলে অবরোধপ্রথা। অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকা। শুধু মেয়ে হবার কারণে মেয়েদের এভাবে কাটাতে হতো বন্দিজীবন। ফলে মেয়েদের লেখাপড়া – সেকালে এরও চল ছিল না।

আসলে মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতেই দিতেন না অভিভাবকেরা। রোকেয়া স্কুলে যাবেন কী করে? লেখাপড়াই বা শিখবেন কীভাবে? কিন্তু তিনি তো দমবার পাত্রী নন। বাড়িতে কোরান পড়া শিখলেন। উর্দুও শিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা শেখার জন্যে তার মন ছটফট করতে লাগল। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের। তারা দুজনেই রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন। এই ভাই-বোনের কাছেই রোকেয়ার যত আবদার। রোকেয়ার পড়াশোনা করার কী অদম্য আগ্রহ! বড় বোনের কাছে তিনি বাংলা শিখলেন। সেও ছিল আরেক যুদ্ধ। রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন। বাবা তখন গভীর ঘুমে, মায়েরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাড়া বাড়ি নিঝ্‌ঝুম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রোকেয়া বই খুলে বসেছেন। এ বই সে বই থেকে ভাই সাবের দিচ্ছেন পাঠ। আর জ্ঞানের জন্যে তৃষ্ণার্ত বোন রোকেয়া শিখছেন কত্তো কিছু! রাতের পর রাত এভাবেই কেটে গেছে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এভাবেই পড়া শিখেছেন রোকেয়া।

সেই সময়টা ছিল আসলে এমনই। মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না লেখাপড়া করবার সুযোগ। যা-কিছু করবার অধিকার, সবই ছিল ছেলেদের। মেয়েরাও যে পড়াশোনা শিখে কিছু করতে পারে, সেকথা কেউ ভাবতেই পারতো না। সবচেয়ে বেশি বাধা আসতো ছেলেদের কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে। খুব অল্প বয়সে তাই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। রোকেয়ার বোন করিমুন্নেসার এভাবেই চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। রোকেয়ার হলো ষোলো বছর বয়সে। বিয়ের পর স্বামীর নামানুসারে তাঁর নাম হলো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এরপর স্বামীর সঙ্গে তিনি পাড়ি জমালেন ভাগলপুরে। ভাগলপুরে স্বামী আর স্বামীর বাড়ির লোকজন উর্দুতে কথা বলেন। রোকেয়াও সেই ভাষাতেই কথা বলতেন। কিন্তু বাংলা ভাষাকে তিনি একদিনের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেননি।

এদিকে হলো কী, কয়েক বছর পরে রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর আগে স্বামী কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। এবার রোকেয়ার শুরু হলো আরেক জীবন। মুসলমান মেয়েরা তখন অনেক পিছিয়ে। লেখাপড়া করার স্কুল নেই। কিন্তু মেয়েদের যদি উন্নতি করতে হয়, লেখাপড়া শিখতেই হবে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি সেটা বুঝেছিলেন। কলকাতায় স্বামীর নামে তাই মেয়েদের একটা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। শুরুতে এই স্কুলের ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচ জন। কিন্তু ধীরে ধীরে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁর বুঝতে কষ্ট হলো না, কেন মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় পিছিয়ে আছে। কত কথা তাঁর মনে, কত কিছু বলবার ইচ্ছা। শুরু হলো লেখালেখি। লেখালেখি মানে যা কিছু বলার জন্যে মন আকুলিবিকুলি করে, তাই লিখে জানাতে শুরু করলেন।

ছোটবেলাতেই দেখেছিলেন, মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। পড়ালেখা করার সুযোগ দেওয়া হয় না। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লেখাপড়া শিখতে পারে না বলে সারাজীবন মেয়েরা আর কিছুই করতে পারে না। ঘরের বাইরে যাওয়া তার নিষেধ। কাজ করবার অধিকারও মেয়েরা পায় না। ঘরের বাইরে যেতে না পারলে কাজ করবেই-বা কী করে? মেয়েরাও যে মানুষ, সে-কথাই তারা প্রায় ভুলে যায়। কিন্তু রোকেয়া বুঝেছিলেন, ছেলেদের যে অধিকার, মেয়েদেরও তো সেই অধিকার থাকবার কথা।

রোকেয়াই বলেছেন, একটা গাড়ির থাকে দুটো চাকা। গাড়ি চলতে হলে চাকা দুটোকে সমান হতে হবে। একটা ছোট আরেকটা বড় হলে সেই গাড়ি চলবে না। মেয়ে আর ছেলে হচ্ছে সেরকমই। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পিছিয়ে থাকলে সেই সমাজের উন্নতি হতে পারে না। দেশেরও নয়। তিনিই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন।

৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রোকেয়া। মৃত্যুও হয় ঐ একই তারিখে, ১৯৩২ সালে। নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং বাক্য গঠন করে পড়ি ও লিখি।

জমিদার	–	ধনী ব্যক্তি, যিনি বহু জমি ও বিষয় সম্পত্তির মালিক।
বনেদি	–	অভিজাত, সমাজের উঁচুতে যার অবস্থান।
ঠাঁট	–	বিলাসী, বেহিসেবী চালচলন। আচার-আচরণ।
হালচাল	–	অবস্থা, দশা।
বিষণ্ন	–	দুঃখিত। মন খারাপ করা অবস্থা।
বন্দি	–	আটক।
চিলেকোঠা	–	বাড়ির ছাদের লাগোয়া ঘর। সিঁড়িঘর।
তক্তপোষ	–	ঘুমাবার আসবাব, চৌকি।
গঞ্জনা	–	নিন্দামন্দ করা, তিরস্কার করা।
স্নেহ	–	ভালোবাসা, প্রেম।
স্বাধীনতা	–	মুক্ত, নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারা।
প্রতিষ্ঠা	–	তৈরি।
লেখালেখি	–	লেখা, রচনা।
উন্নতি	–	কিছুটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় যাওয়া।

সমাজ	–	আমাদের চারপাশের পরিবেশ, মানুষ।
অধিকার	–	দাবি, পাওনা জিনিসের ওপর দখল নেওয়া।
লড়াই	–	যুদ্ধ, সংগ্রাম।
নারী জাগরণ	–	অধিকার সম্পর্কে মেয়েদের সচেতন করে তোলা।
অগ্রদূত	–	যিনি পথ দেখান, সবার আগে আগে চলেন।
চিরস্মরণীয়	–	সব সময় যাকে মানুষ স্মরণ করে, মনে রাখে।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
(খ) বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন ?
(গ) লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন ?
(ঘ) রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন ? কীভাবে ?
(ঙ) সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল ?
(চ) রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয় ?

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় "রোকেয়ার পড়াশোনা করার কী অদম্য আগ্রহ!" – এরকম একটা বাক্য রয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'অদম্য' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে কোনো কিছুতে দমে যায় না।' শব্দটি অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

অনেকের মধ্যে	–	অন্যতম।
জানার ইচ্ছা	–	জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে	–	খেচর।
বিদ্যা আছে যার	–	বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার	–	হাভাতে।

৪. যুক্ত বর্ণের গঠন দেখে নিই ও নতুন শব্দ শিখি।

জ্ঞ	=	জ্+ঞ	।	যেমন– জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান।
ঞ্জ	=	ঞ্+জ	।	যেমন– গঞ্জ, রঞ্জিত, গঞ্জনা।
ণ্ন	=	ণ্+ন	।	যেমন– বিষণ্ন, অক্ষুণ্ন।
ন	=	ন্+ন	।	যেমন– অন্ন, ভিন্ন, ছিন্ন, নবান্ন

মোবাইল ফোন

আজকের দিনে মোবাইল ফোন চেনে না বা দেখেনি – এমন কাউকে বোধহয় পাওয়া যাবে না। আমাদের কারো কারো মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু যাদের নেই তাদেরও অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে ঠিকই জানে – কেউ একটু বেশি, কেউ বা একটু কম। মোবাইল ফোন দিয়ে যে কত রকম কিছু করা যায় তার সবটা অবশ্য সবাই জানে না। তবে যারা একটু কম জানে তারাও প্রয়োজন মতো তাদের কাজটুকু মোবাইলে সেরে নিতে পারে।

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেছেন কে, অথবা এটা কেমন করে কাজ করে। আসলে মোবাইল ফোন একজন কেউ আবিষ্কার করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এটার উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। তারপর কালে-কালে একটু একটু করে আজকের মোবাইল ফোন বেরিয়েছে এবং প্রায় প্রতি বছরই এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে। মোবাইল ফোন সেট দিয়ে এখন ঘড়ির কাজ থেকে শুরু করে কম্পিউটারেরও অনেক কাজ এবং বিচিত্র ধরনের কাজ করা যাচ্ছে। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেল প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন। তাঁর দুই সহকারী গবেষক ছিলেন রিচার্ড এইচ. ফ্রাথকিয়েল এবং জোয়েল এস. এ্যাঞ্জেল। তাঁরাই পরবর্তী কালে মোবাইল ফোনের কৌশল উদ্ভাবন করেন। প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় সেন্ট লুইস শহরে ১৯৪৭ সালে। ধাপে ধাপে এর উন্নতি ঘটে। আগে, ১৯৬৪ সালের দিকে শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন থাকত। তার ওজন ছিল প্রায় ১ কেজি।

১৯৭১ সনে ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭৩ সনে গবেষক মার্টিন কুপার হাতেধরা ছোটসেট তৈরি করেন তিনি এর প্রথম উদ্ভাবক কোয়েল এস. এ্যাঞ্জেলকে প্রথম 'কল'টি করেন।

পাশের ঘরে ফোন করা থেকে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই এখন মোবাইল ফোন দিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে ?

যে এলাকা জুড়ে মোবাইল কাজ করবে তার সবটাকে কতগুলো 'সেল' (ছোট্ট এলাকা বা কোষ) অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক সেলে শক্তিশালী বেতার টাওয়ার (মাস্তুল) বসানো হয়।এই টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে এভাবে যোগাযোগের একটা অদৃশ্য জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরি করে। মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে একটা 'অ্যানটেনা'। সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে সেটি টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে। কোনো সেট থেকে বোতাম চেপে যখন কোনো নম্বরে যোগাযোগ করা হয় তখন সবচেয়ে কাছের টাওয়ারের মাধ্যমে অন্য প্রান্তের ফোন সেটকে সেটি খুঁজে নেয়। একটাতে না পেলে রিলেরেসের মতো করে সেটি পরপর যতগুলো টাওয়ার দরকার তার সব পার হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট নম্বরটিতে। হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে তা তরঙ্গে পরিণত হয়। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যায় অন্য প্রান্তে । আবার গ্রাহকের ফোন সেট বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তরিত করে। এর সবই আপনা থেকেই ঘটে যায়। আগে অবশ্য অপারেটরের সাহায্য লাগত। তবে, অনেক সময় ঠিক মতো কথা শোনা বা বোঝা যায় না। কারণ পুরো নেটওয়ার্ক নানা কারণে কখনো কখনো দুই প্রান্তের 'সেল'–কে ঠিক মতো চিনতে পারে না। অনেকগুলো জায়গায় বসানো নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সমন্বয় করে মোবাইল ফোনের পুরো ব্যাপারটির কাজ চলে।

মোবাইল ফোনের অনেকগুলো সুবিধা আছে। নেটওয়ার্কের জন্য কথা ভালো শোনা না গেলে বা কথা বলতে না চাইলে টাইপ করে ক্ষুদেবার্তা (sms) পাঠানো যায়। মোবাইল দিয়ে ফটো তোলা কিংবা ভিডিও চিত্রও ধারণ করা এবং পাঠানো যায়।

মোবাইল ফোন দিয়ে যেমন অনেক ভালো কাজ হয়, তেমনি এর খারাপ ব্যবহারও হতে পারে। মোবাইল ফোনে খুব বেশি কথা বলা ভালো নয়। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হয়।

পাঠ শিখি

১. কিছু শব্দের অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই।

উদ্ভাবন – আবিষ্কার করা, আগে ছিল না এমন কিছু তৈরি করা। মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে।

তরঙ্গ – কোনো কিছুর ঢেউ। নদীর তরঙ্গ চোখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

গবেষক – যিনি গবেষণা করেন। গবেষক সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

অ্যান্টেনা – কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ, যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে। সব রেডিও এবং মোবাইল ফোনের অ্যানটেনা থাকবেই।

রূপান্তরিত – এক রকম থেকে আর এক রকম করে ফেলা। পানি ফুটলে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়।

যন্ত্রচালক/ অপারেটর – যিনি যন্ত্র চালু রাখেন। আগের দিনে টেলিফোন চালাতেন অপারেটর। আজকাল অপারেটর ছাড়াই মোবাইল ফোন চলে।

ক্ষুদেবার্তা – খুব কম শব্দে কিছু লিখে খবর পাঠানো। তোমার ক্ষুদেবার্তা পেয়ে বিষয়টি জেনেছি বলে ধন্যবাদ।

sms – short message service। মোবাইল ফোনে পাঠানো ক্ষুদেবার্তার ইংরেজি নাম। বাড়ি পৌঁছে আমাকে sms পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

সমন্বয় – সামঞ্জস্য, মিলন। তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের সমন্বয় করতে হবে।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) মোবাইল ফোন কী ?

(খ) মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে ?

(গ) মোবাইল ফোন আবিষ্কারে কার কার নাম বলতে পারবে ?

(ঘ) মোবাইল সেট থেকে কীভাবে অন্য জনের সাথে কথা হয় ?
(ঙ) অনেক সময় মোবাইল ফোনে ঠিক মতো কথা শোনা যায় না কেন ?
(চ) মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী বসাতে হয় ?
(ছ) ক্ষুদেবার্তা কী এবং এটা কখন কাজে লাগে ?

৩. ডান দিকের সঙ্গে বাম দিকের শব্দ সাজাই।

পরিবর্তন	কৌশল
বিচিত্র	পর্যায়
গ্রাহাম	ওয়ার্ক
যন্ত্রের	টাওয়ার
সীমিত	মধ্যে
বেতার	ধরনের
শক্তিশালী	বেল
মুহূর্তের	তরঙ্গ
নেট	উন্নয়ন

৪. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি।

প্রায় প্রতি বছরই এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ——————।	ক্ষুদেবার্তা
এখন মোবাইল ফোন দিয়ে —————— করা হচ্ছে।	রূপান্তরিত
সারাক্ষণ ——— মাধ্যমে সেটটি ——— সাথে যোগাযোগ রাখে।	ঘটছে
ফোন সেট বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে ——— করে।	তরঙ্গের, টাওয়ারের
কথা বলতে না চাইলে টাইপ করে —————— পাঠানো যায়।	যোগাযোগ

৫. বিপরীত শব্দ লিখি।

বেশি	–
আগে	–
শক্তিশালী	–
তোমার	–
ঠিক	–
ভালো	–

৬. সংখ্যাবাচক শব্দ শিখি।

এই লেখায় 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' এরকম শব্দ রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় সংখ্যাবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ। এভাবে আরও কয়েকটি শব্দ শিখি।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য	ক্রমবাচক বিশেষণ
এক	প্রথম
দুই	দ্বিতীয়
তিন	তৃতীয়
চার	চতুর্থ
পাঁচ	পঞ্চম
ছয়	ষষ্ঠ
সাত	সপ্তম
আট	অষ্টম
নয়	নবম
দশ	দশম

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিনয় করি।

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায়

ছুটলে কথা, থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে –
রাম-খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

আবোল-তাবোল কথা বলার মানে – মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে-কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। যেমন, যদি বলি – মা, ভাত খাব, মা তখন আমায় ভাত দিতে ছুটবেন! কিন্তু যদি ভূতের মতো নাকী সুরে বলি 'আঁউ মাঁউ খাঁউ ভাঁতের গন্ধ পাউ' তখন মা ভাববেন, আমি খেলা করছি। সেটা তখন আবোল-তাবোল কথা হয়ে গেল, যে কথার অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এই কবিতা সে-রকমই একটি কবিতা যা জোরে জোরে পড়লেই শুনতে মজা লাগে। একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই বকবক করে কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম নামল ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি।

ঠেকায় – বাধা দেয়, মানা করে।

তবলা – একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র । হারমোনিয়াম, তানপুরা, সেতার, সারেঙ্গি যেমন বাদ্যযন্ত্র তবলাও আরেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র । কেউ যখন গান গাইতে বসে তখন সে হারমোনিয়ামের রিড টিপে সুরেলা আওয়াজ বের করে। সেই সুরের সঙ্গে গায়ক তার গলা মেলায়। পাশে তবলা নিয়ে বসে থাকে তবলা বাদক। সে তখন তবলায় চাঁটি মেরে নানা রকমের আওয়াজ বের করে।

ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ – এক কোপে কিছু কেটে ফেলার আওয়াজ।

প্যাঁচ – যা সোজা-সরল নয়, যা ঘোরানো, জড়ানো, প্যাঁচানো। দড়ি বা রশি বাঁধতে হলে আমরা গিঁট দিই। প্যাঁচ না দিলে গিঁট বাঁধা যায় না।

ঘুম – তন্দ্রা, নিদ্রা।

ঘনিয়ে এলো – ঘন হয়ে এলো, জড়ো হলো।

মনের মাঝে – মনের ভিতরে।

সাঙ্গ – শেষ, সমাপ্ত।

রাম-খটাখট – খুব জোরেসোরে খটাখট শব্দ। ('রাম' – উচ্চারণ রাম। এই শব্দে আমরা বড় আকারের কিছু বোঝাই। যেমন – রামছাগল, রাম বোকা, হাঁদারাম)

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কী ছুটছে যাকে থামানো যাচ্ছে না ?
(খ) ধাঁই ধপাধপ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজছে ?
(গ) প্যাঁচানো কথা কী দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ?

৪. কবিতাটিতে যা বলা হয়েছে তা গদ্যে বর্ণনা করি।

৫. কবিতাটি মুখস্থ করি ও বলি।

৬. বই না দেখে কবিতাটি ঠিকমতো লিখি।

কবি পরিচিতি

সুকুমার রায়

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'আবল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হলেও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

হাত ধুয়ে নাও

অন্তু খুব হাশিখুশি ছেলে। পড়াশোনায় ভালো অন্তু, খেলাধুলায়ও বেশ। কিন্তু একটু চঞ্চল। আর কোনো কিছুর খুব একটা বাছবিচার করে না সে। মামাকে মা জানিয়েছিল, আজকাল অন্তুর শরীরটা সব সময় ভালো যায় না। প্রিয় ভাগিনাকে অনেক দিন দেখেন নি মামা। তাই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছেন।

অন্তু বাইরে খেলা করছিল। মামার আসার কথা শুনে ছুটে চলে আসে ঘরে। ঘরে ঢুকেই সুগন্ধটা পায় সে। মামার হাতে ওর প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। মামার কোল থেকে নেমেই বিরিয়ানি দেখেই সে হামলে পড়ে প্যাকেটটার ওপর। তর সইছে না তার। প্যাকেট খুলে নিয়েই হাত দিয়ে খাবলে খেতে শুরু করে।

– কী যে মজা, মামা ...। কথা শেষ হয় না, মামা ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে নেন অন্তুর কাছ থেকে। অন্তু ভেবাচেকা খেয়ে যায়। কী হলো ! একটু আগেই যে-মামা কোলে করে অত আদর করলেন, সেই মামাই এমনটি করতে পারে !

– অন্তু, এটা তো ঠিক হলো না। এভাবে খায় নাকি ?

মামার তো জানাই আছে, অন্তু কোনো কিছু খুব একটা বাছবিচার করে না। তারপর মামা এমনটা করলেন! অন্তু গাল ফুলিয়ে হাতটাই চেটেপুটে খেতে থাকল। অমনি আবার মামা ওর হাত চেপে ধরলেন।

– অন্তু, এভাবে খায় না।

মা এসে আবার এক প্রস্থ বকাবকি করেন।

– আহ্ বুবু, আমি দেখছি। মামা-ভাগিনার মধ্যে এসো না তো।

এবার মামা ওকে স্নানঘরে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে অন্তুর হাত ধুইয়ে দেন। বিরানির প্যাকেটের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলেন, নাও এবার খাও। তোমার জন্যই তো আনা।
খেতে খেতে অন্তুর নাকে সর্দির পানি এসে যায়। ও সেটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে সার্টের সঙ্গে মুছে নেয়। মামা দেখে আবার চোখ পাকান।

মা বলতে থাকেন, বুঝলি সান্টু। ছেলেটাকে এত দেখে-শুনে রাখি, তারপরেও দ্যাখ, আজকাল ওর যেন এটা-সেটা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। ভাবছি ভালো ডাক্তার দেখাব।
বাবা তাতে যোগ করেন – সান্টু, তোমার জানা ভালো ডাক্তার কেউ আছেন ?

– আচ্ছা, আমি দুদিন আছি। একটু দেখে নিই। মনে হয়, ওর কোনো বিশেষ অসুখ নয়। ওর দরকার আরও সতর্ক হওয়া।
একটু পরেই দেখা গেল অন্তু টয়লেট থেকে বের হচ্ছে। তারপর সোজা ছুটে চলে গেল বাইরের খেলায়।

সন্ধ্যায় মামা অন্তুর সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন। ওর সারা দিনের চলাফেরা, মুখ-হাত ধোয়া, গোসল করা, খাওয়াদাওয়া, সব কিছুর একটা হিসাব নিলেন। পর দিন বিকেলে অন্তুর সঙ্গে

মামা মাঠে গেলেন। ঘরে ফিরে মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তুর মুখ-হাত ধোয়ালেন। মা দেখে মুচকি হেসে বলেই ফেললেন : আমার কথা তো শোনো না বাছা। এখন মামা এসেছে বলে কত ভালো ছেলে।

বাবা হেসেই বললেন না, অন্তু তো বরাবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো ছেলে।

মামা বলেন হ্যাঁ ভালো ছেলে বটে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কতটা সেটাই তো দেখছি।

তারপর অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা বলতে থাকেন : আমি সব দেখলাম ভাগিনা। তোমার একটা অভ্যাস ভালো করতে হবে। আর তা হচ্ছে 'হাত ধোয়া'। তুমি ঠিক মতো হাত ধোও না, হাত পরিষ্কার করো না। বিশেষ করে খাওয়ার আগে আর টয়লেট থেকে এসে। নাকের সর্দিও যেমন-তেমন করে মোছ। তারপর হাতও দেখলাম ধোও না। এগুলো মোটেই ভালো নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রথম কাজই হলো ঠিক মতো হাত ধোয়া। তোমার নখগুলোও পরিষ্কার নয়। রোগবালাইয়ের শুরু কিন্তু এখান থেকেই।

– দ্যাখো মামা, আমার হাত তো... পরিষ্কার দেখাচ্ছে না ? অন্তু বলার চেষ্টা করে।

– পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে পরিষ্কার হয় না। আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই। এই সব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায়। খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে এমনটা হয়। এই রকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ভালো করে হাত না ধুলে ঐসব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে যায়। আর বেশির ভাগ পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর এই সব জীবাণু থেকে হয় । কাজেই দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। বিশেষ করে খাবার আগে আর টয়লেট সেরে আসার পরে সাবান দিয়ে দুই হাতের দুই পিঠই ধোয়া জরুরি।

ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলেই দেখবে তোমার অসুখ-বিসুখ কমে গেছে। বিদেশে অনেকে হাত পরিষ্কার রাখার জন্য হাতমোজা ব্যবহার করেন। আর হাত দিয়ে না খেলেও সময় মতো বার বার ওঁরা হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখেন।
অন্তুর বাবা বলেন : ওকেও তো বলি। যখন বলি তখন করে। কিন্তু সব সময় কি করে?

মা বললেন : শুনলি তো বাবুসোনা ! আমাদের কথায় তো গা করো না, মামার কথাই না হয় শুনলে।

আমার বাংলা বই

অন্তু, আর যা–ই হোক, মামার কথা ফেলবে না। কারণ সে মামার মতো বিখ্যাত হতে চায়। ঘুমোতে যাবার আগে অন্তু মামার কাছে কথা দেয়, ঠিকমতো হাত ধোবে, সবাইকে বলবে, 'সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধুয়ে নাও।'

পাঠ শিখি

১. সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) অন্তু মামার কাছ থেকে কিসের সম্পর্কে জেনেছিল ?
(খ) কেন অন্তুর এটা-সেটা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকতো ?
(গ) সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয় ?
(ঘ) হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয় ?
(ঙ) হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে ?
(চ) কিসের অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায় ?
(ছ) অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল ?

২. শব্দের ব্যবহার জেনে নিই ।

চঞ্চল – অস্থির, অশান্ত , ছটপটে। চঞ্চল চড়ুই পাখি কিন্তু কৃষকের বন্ধু।

বাছ-বিচার – বাছাই করা বা ভালোমন্দ বিচার করা। অনেকেই কিছু খেতে কোনো বাছ-বিচার করে না।

হামলে পড়া – হামলা মানে আক্রমণ। আর "হামলে পড়া" বললে আক্রমণ করার মতো বোঝায়। সকালের পত্রিকাটা আসতেই সবাই ওটার ওপর হামলে পড়ল।

খাবলে খাওয়া – খাবলা মানে হাতের থাবা পরিমাণ। খাবলে খাওয়া বললে এক থাবায় যতটুকু তুলে খাওয়া যায় তাই বোঝায়। খুব ভুখা লোকটি খাবার পেয়ে খাবলে খেতে থাকল।

চেটেপুটে – চাটা মানে জিহ্বা দিয়ে লেহন করা। জিহ্বা আর ঠোঁট দিয়ে একসাথে চেটে-চুষে খেলে হয় চেটেপুটে খাওয়া। মজার আচার হাত দিয়ে ওরা চেটেপুটে খাচ্ছে।

অসুখ-বিসুখ – রোগ-ব্যধি। শরীর যত্ন না নিলে অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকবে।

টয়লেট – ইংরেজি toilet–এর সাধারণ অর্থ পায়খানা। পায়খানা করাকে এখন বাংলায় বলা হয় টয়লেট করা।

জীবাণু – খালি চোখে দেখা যায় না এমন অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী যেগুলো মানুষের ক্ষতি করে। জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুব জরুরি।

৩. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করি।

তর সইছে না, দেখে-শুনে রাখি, রোগবালাই, চোখ পাকান, কথা দেয়

(ক) মামা যখন ———————— তখন তো সাবধান হয়ে যাই।

(খ) ———————— থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।

(গ) আমি ঘর বাড়ি গোছাই আর সব ————————।

(ঘ) কখন যে পুরষ্কারটা খুলে দেখব ? আমার আর ————————।

(ঙ) অনেকেই———————— কিন্তু কাজ ঠিকমতো করে না।

৪. গোসল করা কেন দরকার – পাঁচটি বাক্যে বলি ও লিখি।

৫. বাংলা ভাষায় অনেক রকমের শব্দ আছে। এগুলো বিদেশি। এই লেখাটিতে টয়লেট, বিরিয়ানি, জরুরি– এ শব্দগুলো হলো বিদেশি। এরকম আরও কয়েকটি শব্দ জেনে নিই।

রিক্সা, সরকারি, আদালত, বেঞ্চ, স্টেডিয়াম, স্টেশন, বাস ইত্যাদি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) বাড়িতে কীভাবে হাত ধুই তা জানাই।

(খ) শ্রেণিকক্ষে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভিনয় করে দেখাই।

মোদের বাংলা ভাষা

সুফিয়া কামাল

মোদের দেশের সরল মানুষ
কামার কুমার জেলে চাষা
তাদের তরে সহজ হবে
মোদের বাংলা ভাষা।

বিদেশ হতে বিজাতীয়
নানান কথার ছড়াছড়ি
আর কতকাল দেশের মানুষ
থাকবে বল সহ্য করি।

যারা আছেন সামনে আজও
গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা
আমার দেশের সব মানুষের
এই বেদন বুঝুন তারা।

ভাষার তরে প্রাণ দিল যে
কত মায়ের কোলের ছেলে

তাদের রক্ত-পিছল পথে
এবার যেন মুক্তি মেলে।
সহজ সরল বাংলা ভাষা
সব মানুষের মিটাক আশা।

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলে। কামার কুমার জেলে চাষি সকলেই এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার জন্যে ১৯৫২ সালে ছাত্র–ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। গুলিতে অনেকে মারা গিয়েছিল। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা একমাত্র মাতৃভাষা বাংলাই মেটাতে পারে। বিদেশের নানান ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার ভিতরে ঢোকানো ঠিক নয়। আমরা বাংলায় যখন কথা বলি তখন নানান ইংরেজি শব্দ তার মধ্যে ব্যবহার করি, এটি করাও ঠিক নয়।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি।

কামার	–	যারা লোহা পিতল ইত্যাদি দিয়ে জিনিসপত্র (যেমন হাঁড়ি-পাতিল, বাসন, খুন্তি , চাটু বা তাওয়া) তৈরি করে।
কুমার	–	কুমোর। যারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি তৈরি করে।
সহ্য করা	–	সওয়া, মেনে নেওয়া।
জ্ঞানী	–	জ্ঞানবান লোক, যাঁর অনেক জ্ঞান।
মনীষী	–	শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী বিখ্যাত মানুষ।
রক্ত-পিছল	–	রক্তে যা পিছল হয়েছে। (রক্ত যদিও পানির মতো তরল পদার্থ তবু পানির মতো নয়। রক্তের গন্ধ আছে, পরিষ্কার ভালো পানির কোনো গন্ধ নেই। রক্ত চটচটে আঠার মতো, কিন্তু পানি তেমন নয়। রক্ত আঠার মতো বলেই তা পিছল।)
মুক্তি	–	স্বাধীনতা, খোলামেলা অবস্থা।
বিজাতীয়	–	অন্য জাতির, ভিন্ন জাতির বা দেশের।
বেদন	–	বেদনা, দুঃখ, কষ্ট।
মিটাক	–	মিটিয়ে দিক, পূর্ণ করুক।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি, পরে লিখি।

(ক) বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' কোন ভাষায় কথা বলে ?
(খ) বিদেশি ভাষার শব্দ কোন ভাষাতে 'ছড়াছড়ি' ?
(গ) এ দেশের মানুষের 'বেদন' কী ?
(ঘ) কিসের ছড়াছড়ি সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে ?

৪. কবিতাটিতে যা বলা হয়েছে তা অল্প কথায় লিখি।

৫. কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলি।

৬. কবিতার প্রথম আট লাইন বই না দেখে ঠিকভাবে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) বাংলা ভাষার ওপর লিখিত অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া শিখি ও আবৃত্তি করি।

(খ) শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা ভাষা বিষয়ক স্মরণীয় বাণী পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করি।

কবি পরিচিতি

সুফিয়া কামাল

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সাঁঝের মায়া', 'মায়াকানন', 'ইতল বিতল', 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

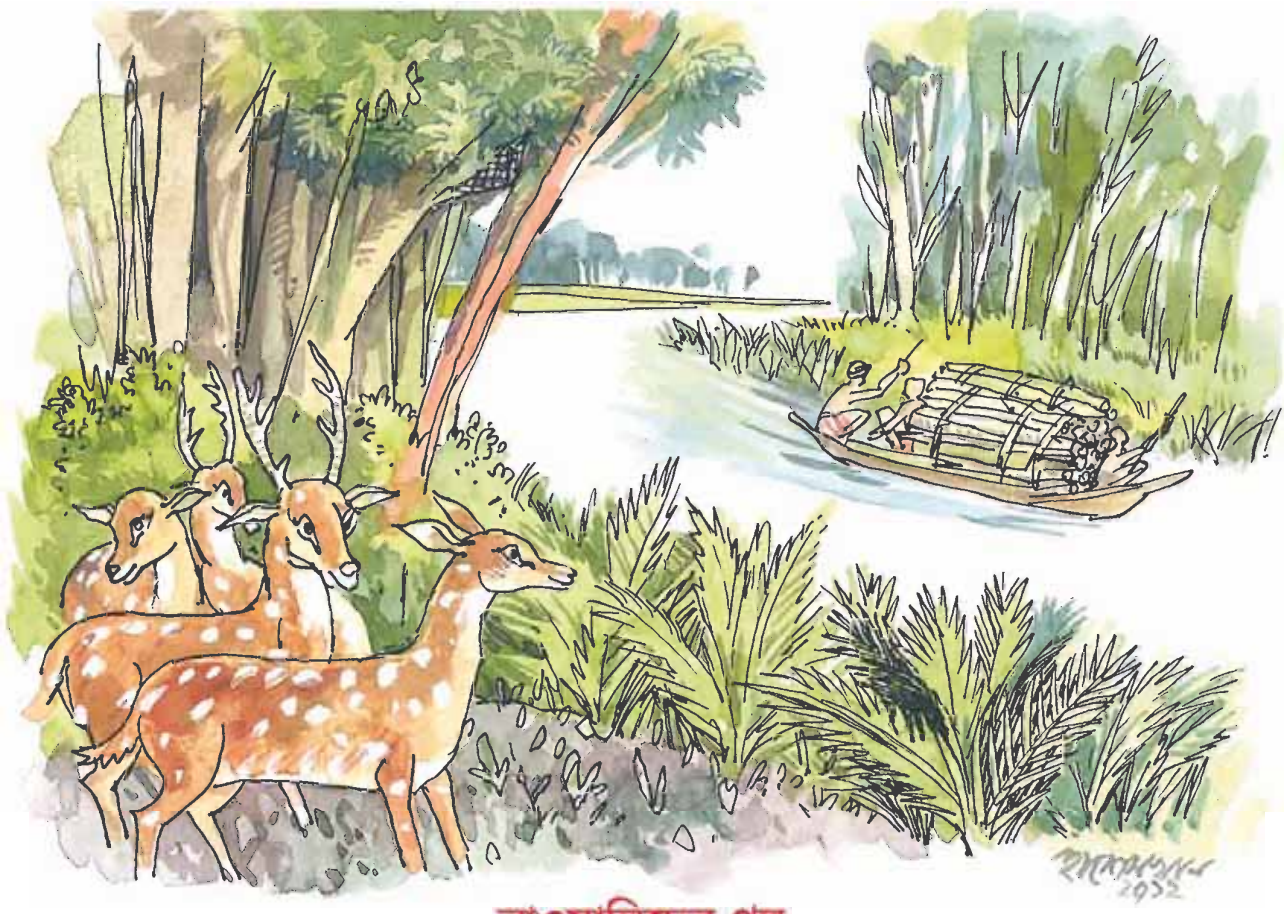

বাওয়ালিদের গল্প

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ। এখানে নেই কী? এ দেশ পাহাড়ি দেশ নয়, সবই সমতলভূমি। কিন্তু এখানে পাহাড় আছে। সে পাহাড় চট্টগ্রাম আর রাঙ্গামাটিতে। বাংলাদেশ যে নদী-নালার দেশ, আমরা জানি। কিন্তু এখানে সমুদ্রও রয়েছে। বাংলাদেশ তার পা ধুয়ে নিচ্ছে বঙ্গোপসাগরের পানিতে। কিন্তু সেই সমুদ্রের ঠিক ওপরেই রয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবন নামটিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি একটি বন বা অরণ্য। এর অর্থ – এখানে হাজার হাজার রকমের গাছপালা আছে। কোনো কোনো জায়গায় গাছপালা এত ঘন যে সূর্যের আলো গাছপালার ফাঁকফোঁকর দিয়ে নিচে মাটিতে পড়ে না।

সুন্দরবনে নানা রকমের পশুপাখি থাকে। মানুষও কিন্তু সেখানে বসবাস করে। তারা গ্রামের মানুষ। সুন্দরবনের চারদিকে অনেক গ্রাম ছড়িয়ে আছে। গ্রামের লোকেরা কৃষিকাজ করে, অর্থাৎ জমিতে ফসল ফলায়। কিন্তু এমন লোকজনও অনেক রয়েছে যারা সুন্দরবনে কাঠ কাটতে যায়, সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করতে যায়। মৌমাছি গাছে গাছে তাদের মৌচাক তৈরি করে তার মধ্যে থাকে। মৌচাকের ভিতর থেকেই লোকে মধু জোগাড় করে থাকে। এভাবে গ্রামবাসীরা সুন্দরবনকে কাজে লাগিয়ে তাদের আয় উপার্জন করে, সেই টাকা-পয়সায় নিজেদের সংসার

চালায়। যারা বাওয়ালি তারাও পয়সা-কড়ি কামায় সুন্দরবনের ভিতর থেকে নানারকম কাজ করে।

সুন্দরবনে যারা কাঠ কাটে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে, তাদের একটা নাম আছে – বাওয়ালি। বাওয়ালি বললেই লোকে বুঝতে পারে – সুন্দরবনে বাস করে, কাঠ কাটে, এমন মানুষের কথা বলা হচ্ছে। বাওয়ালিদের জীবন খুব কঠিন। কাঠ কাটা, সেগুলো গাঁটরি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যাওয়া পরিশ্রমের কাজ। জীবন কঠিন শুধু ও-কারণে নয়। সুন্দরবনে অনেক হিংস্র জীবজন্তু রয়েছে, যেমন বাঘ। বাঘ মাংসাশী প্রাণী, অর্থাৎ অন্য জীবজন্তুর মাংস খায়। সে সবের মধ্যে গোরু ছাগল ভেড়া মহিষ যেমন থাকে, তেমনি রয়েছে মানুষও। বাওয়ালিদের সবচেয়ে বড় ভয় ঐ সব জীবজন্তুকে।

বাওয়ালিরা যখন সুন্দরবনের ভিতরে গিয়ে কাজ করে তখন তারা থাকে কোথায়? নিজেদের নিজস্ব ঘরবাড়ি তো দূর দূর গ্রামে। রোজ গ্রামে ফিরে যাওয়া, পরদিন ফের গ্রাম থেকে জঙ্গলে আসা, আবার সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফেরা – এভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাহলে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলে তারা কোথায় খায়-দায়, কোথায় শোয়া-বসা করে? মাটির ওপরে কুঁড়েঘর তৈরি করে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বাঘ, শেয়াল বা ঐ ধরনের হিংস্র প্রাণী কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে, তারপর গর্তের ভিতর বসে চিবিয়ে খাবে। তাই বাওয়ালিরা সুন্দরবনের ভিতরে ঘর বাঁধে না, তারা থাকে টোঙে। টোঙ হলো গাছের ওপর তৈরি করা ঘর। মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে বড় কোনো গাছের ডালপালার ভিতরে টোঙ তৈরি করা হয়।

বাওয়ালিদের একটা বিপদ ডাঙ্গায়, অর্থাৎ যে সব প্রাণী মাটির ওপর বাস করে তারাই বিপদ ঘটায়। যেমন বাঘ, শেয়াল, ভালুক, বনবেড়াল, বুনোশুওর, বেজি,সাপ ইত্যাদি। কিন্তু জলেও তো বিপদ কম নয়। জলে থাকে কুমির, হাঙ্গর ইত্যাদি। প্রাণিজগতে মানুষ হলো সবচেয়ে অসহায়। কারণ তার বড় বড় দাঁত নেই। বড় বড় নখ নেই হাত-পায়ে, মাথায় শিং নেই গুঁতোবার জন্যে। ফলে বাওয়ালিদের বিপদের ভয় চারদিকেই। তাই তাকে সব সময়ে সাবধান থাকতে হয়। বিপদে যাতে না পড়ে সেজন্য সতর্ক থাকতে হয়।

বাওয়ালিদের আরও একটা ব্যাপারে খুব কষ্ট হয়। সুন্দরবনের ভিতরে যে সব নদী আছে তাদের জল লবণাক্ত অর্থাৎ নোন্‌তা। নোনতা পানি মানুষ খেতে পারে না। বাওয়ালিরা তাই সুপেয় জল অর্থাৎ খাওয়ার পানি ছোট কলসিতে ভরে নিয়ে যায়। খুব হিসেব করে সেই পানি খায়, অপচয় করে না। কারণ পানি শেষ হয়ে গেলে পানি পাবে কোথায়? আর একটা কথা। কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং নদীতে মাছ ধরে সেই মাছ রান্না করে খায়।

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঠ কাটে, সেই কাঠ জোগাড় করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তাদের নাম বাওয়ালি। তাদেরকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় জীবনধারণের জন্য। তারা মৌমাছির মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। এ সব কাজ করতে গেলে অনেক বিপদের সম্মুখীন তাদের হতে হয়।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

জন্মভূমি – যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মায় সে দেশ তার জন্মভূমি।
সমতলভূমি – মাটি যেখানে এবড়োথেবড়ো নয়, সমান।
কৃষিকাজ – চাষাবাদ।
সংগ্রহ করা – জোগাড় করা, সঞ্চয় করা।
পরিশ্রম – খাটাখাটুনির কাজ, কষ্ট।
হিংস্র – কারো ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো রাগ যার রয়েছে।
মাংসাশী – মাংস যে আহার করে, মাংসই যার প্রধান খাদ্য।
সতর্ক – সাবধান।
লবণাক্ত – লবণ মেশানো। নোনতা স্বাদের।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি, পরে লিখি।

(ক) 'বাওয়ালি' কাদের নাম ?
(খ) বাওয়ালিরা থাকে কোথায় ?
(গ) সুন্দরবন বাংলাদেশের কোন জায়গায় রয়েছে ?
(ঘ) মৌচাক কাকে বলে ?
(ঙ) মৌচাকে কী পাওয়া যায় ?
(চ) 'টোঙ' কাকে বলে ?

৪. বাওয়ালিদের কথা যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৫. গল্পে মৌমাছি, মৌচাক, মধু – এ শব্দগুলো আছে। এ সম্পর্কে আরও জেনে রাখি।

মৌমাছি নানা ধরনের ফুল থেকে একটু একটু করে মধু সংগ্রহ করে। তারপর, মধু জমা করে রাখে এক জায়গায়। ঐ জায়গাটাই হলো মৌচাক। সুন্দরবন ছাড়াও আমাদের চারপাশের বাগানের কোনো না কোনো গাছে এ মৌচাক বা মধুরচাক দেখা যায়। কখনো কখনো মৌমাছিরা দালানঘরের ছাদের কিনারেও মৌচাক বানায়। আমাদের চারপাশে যারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে তাদের মৌয়াল বলে। এখন মানুষ নিজেই মৌমাছি দিয়ে ঘরে বা নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় মৌচাষ করে, মধু সংগ্রহ করে। একে বলে কৃত্রিম মৌপালন বা কৃত্রিম মৌচাষ। মধু খেতে শুধু মিষ্টিই নয়, এর আছে অনেক গুণ।

অনুশীলনমূলক কাজ।

আমাদের বাড়ির বা প্রতিবেশী বড়দের নিকট থেকে জেনে নিয়ে মধুর কয়েকটি গুণ লিখি এবং শ্রেণির সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

আমার চেনা-জানা কয়েকটি পেশার নাম লিখি। যে কোনো একটি পেশার কাজের বর্ণনা দিই।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই-বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?

খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, – তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?
বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে –
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোঁপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না –তাইতো জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ?

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

ক. ছোট্ট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে গেছে তা সে জানে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না, তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি।

শোলক – শ্লোক, ছোট পদ, ছড়া। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে মা শোলক বলতেন।
জোনাই – জোনাকি পোকা। আঁধার রাতে ঝোঁপে-ঝাড়ে জোনাই জ্বলে।
দিদি – বড় বোন, আপা। দিদি আমাকে খুব স্নেহ করেন।
নেবু – লেবু। মা নেবু দিয়ে আচার তৈরি করছেন।
ভুঁইচাঁপা – মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল। ভুঁইচাঁপা গাছে মাঠ ছেয়ে গেছে।
মাড়াসনে – পা দিয়ে পিষে যাওয়া। নিপা, ফুল গাছগুলো মাড়াসনে।

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

দিন – রাত। ঘুম – জাগরণ। ঢাকা – খোলা। নতুন – পুরনো। জ্বলা – নেভা।

৪. ডান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি।

(ক) কোথায় জোনাকি জ্বলে ? নেবুর তলে/বাঁশবাগানে/ শিউলিতলে/ তাল তলায়
(খ) বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে ? শিউলির ডালে/ ভুঁইচাঁপার ডালে/আমের ডালে/ডালিমের ডালে
(গ) কে শোলক বলতেন ? মা/দিদি/দাদু/বাবা
(ঘ) ঝিঁঝিঁ কোথায় ডাকে ? ঝোপে-ঝাড়ে/গাছের ডালে/আঁধার রাতে/ঘরের মাঝে
(ঙ) ঘুম আসে না কেন ? নেবুর গন্ধে/ঝিঁঝিঁর ডাকে/চাঁদের আলোতে/ফুলের গন্ধে

৫. পরের চরণ মুখে বলি ও লিখি।

(ক) পুকুর ধারে, নেবুর তলে
.....
....., ...
.....।
..... ?

(খ) দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে .....
.... ?
....।

৬. নিচের প্রশ্নোগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

(ক) কাজলা দিদি কোথায় গেছে ?
(খ) কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে ?
(গ) কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন ?
(ঘ) পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন ?
(ঙ) আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে – এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে ?
(চ) খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে এবং ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে ?

৭. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন – বাঁশবাগান)।

পুতুল	তলে
থোকায়	ধারে
পুকুর	বিয়ে
নেবুর	ঘরে
শোলক	থোকায়
কাজলা	বাগান
বাঁশ	বলা
নতুন	দিদি

৮. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ভাব বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়ি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি ।

কবি পরিচিতি
যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলায় জন্মেছিলেন ১৮৭৯ সালে। তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও 'মানসী' ও 'পূর্বাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পল্লিপ্রীতি তাঁর বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'লেখা', 'কেয়া', 'বন্ধুর দান' ইত্যাদি। 'কাজলা দিদি' কবিতাটি 'কাব্যমালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাখির জগৎ

বড় বোন ঝর্ণা। নতুন শ্রেণিতে উঠেছে। স্কুল থেকে পেয়েছে নতুন বই। কয়েক দিন পরেই শুরু হবে তার ক্লাস। বইটা হাতে পেয়ে তার সে কী আনন্দ! পাতা উল্টেই চোখ আটকে গেল একটা কবিতায়।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইলো।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিলো।

পাশে বসেই পড়া করছিল ছোট ভাই সাম্য। কবিতার কথাগুলো তার কানে গেল। তাই তো, ভোর হলেই পাখি ডেকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়। চোখের পাতা তখনও নিমীলিত। আলস্য ভেঙে ঘুম থেকে উঠতেই হয়। পাখিরা যেন ভোরের দূত। রোদের পিঠে চড়ে উড়ে এসে যেন ঘোষণা করে – শুরু হলো আরেকটা দিন। দূর থেকে চড়ুই শালিক এরকম দু-একটা পাখিকে সাম্য দেখেছে। কিন্তু আরও যে নানা ধরনের পাখি আছে, সে সব পাখির কথা জানতে ইচ্ছে করে। মাকেই সে জিজ্ঞেস করবে পাখিদের কথা। মা তো অনেক অনেক বই পড়েন।

আচ্ছা মা, পাখিরা কী নিশাচর প্রাণী? ভোর না হতেই কিচিরমিচির করা শুরু করে দেয়। মা বলেন, তা হবে কেন। পাখিরাও ঘুমোয়। কৌতূহল আরও বেড়ে গেল সাম্যর। মা বলেন, পাখির দেশ, নদীর দেশ বাংলাদেশ। পাখিরা প্রকৃতির অংশ। গাছে গাছে ঝোপঝাড়ে প্রান্তরে নদীতীরে তাদের বিচরণ। কখনও তারা দল বেঁধে আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। কখনও পাতার ফাঁকে চুপ করে বসে থাকে। কখনও খাবারের খোঁজে পোকামাকড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাখির প্রধান বৈশিষ্ট্য, পালক দিয়ে চেনা যায়। অধিকাংশ পাখি ডানার উপর ভর করে উড়তে পারে। পাখির সংখ্যাও অনেক। পৃথিবীতে দশ হাজার প্রজাতির প্রায় পঞ্চাশ লাখ পাখি আছে। বাংলাদেশে আছে চৌষট্টিটি প্রজাতির ছয় শো পাখি। এর মাঝে স্থানীয় পাখির সংখ্যা চার শো, অতিথি পাখি দুই শো।

'কয়েকটা পাখির কথা বল–না, মা।' – আদুরে গলায় মাকে পাখির কথা বলতে বলে সাম্য। দোয়েলের কথা তো জানই, বলতে শুরু করেন মা। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। খুবই পরিচিত। পালকগুলো সাদা কালো। লেজটা ঊর্ধ্বমুখী। লোকালয়ে আর অগভীর জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ায়। বসে থাকে গাছের উঁচু ডালে আর মাঝে মাঝে মধুর সুরে গানের তালে তালে লেজ নাচায়। শিকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে তিন থেকে পাঁচটি। বিভিন্ন ফুলের মধু আর কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

দুদণ্ড ফুসরত নেই। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। ক্লান্তিহীনভাবে এভাবে যে পাখিটি ডেকে চলে, সেটি হলো চড়ুই। আমাদের ঘরেরই একজন। লোকালয়ই এদের প্রিয় জায়গা। বাসাবাড়ির ঘুলঘুলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি করে। চড়ুই ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়। মাথা ছাই রঙের। পিঠে বাদামি পালক। তার উপরে কালো ছোট দাগ। ডানার উপরে সাদা অথবা লালচে রেখা। বাসার মধ্যে নরম পালক বা কাপড় বিছিয়ে তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। এই পাখি কৃষকের বন্ধু। কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলের শত্রু নাশ করে। তবে পাকা ফল ও শস্যদানাও এদের প্রিয় খাদ্য। পাকা ফলের খোঁজ পেলে দল বেঁধে ভূরিভোজে মেতে ওঠে।

আমার বাংলা বই

দোয়েল

চড়ুই

টুনটুনি

আবাবিল

বুলবুলি

পানকৌড়ি

ছোট্ট আরেকটি পাখি টুনটুনি। পালকের রঙ জলপাই সবুজ। মাথায় লাল আভা। লম্বা ঠোঁটের রঙ কালচে খয়েরি। পায়ের রঙ হলুদাভ। পিঠের উপরের লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়। মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। পাখির পালক, গরু-ঘোড়ার লেজের চুল, লতা, তুলো, সুতো মিশিয়ে চমৎকার বাসা বানায়। ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। ফুলের মধুই টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়িয়ে পরাগায়ণে সাহায্য করে।

শীতকাল। সারিবদ্ধভাবে প্রায় স্থির বসে থাকে যে পাখি, তার নাম আবাবিল। বিলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই, আছে নলখাগড়া বা আখখেতের সঙ্গে। রাত হলে ওখানেই আশ্রয় নেয়। এদের পিঠের রঙ নীলাভ কালো। নিচের দিকে সাদা-হলুদের মিশ্রণ। কপাল বাদামি। সাবলীল ভঙ্গিতে ওড়ার সময় লেজটা দুভাগ হয়ে যায়। উড়ন্ত অবস্থাতেই পোকামাকড় ধরে খায়।

চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল স্বভাবের আরেকটি পাখি আছে – বুলবুলি। এই পাখি কলহপ্রিয়, কিছুটা দুর্বিনীত। বুলবুলির মাথা ও গলা কালো। মাথার উপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি। এর তলপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। ঠোঁট ও পা কৃষ্ণবর্ণের। খুব দ্রুত উড়তে পারে। পোকামাকড় কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশকে বাঁচায়।

পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখির নাম পানকৌড়ি। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। পুকুর খাল বিল এদের বিচরণ-ক্ষেত্র। আকারে দাঁড়কাকের চাইতে কিছুটা বড়। ঠোঁট তীক্ষ্ণ আর বাঁকানো। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। ডুব দিয়ে মাছ ধরে। মাছকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে উড়ন্ত অবস্থায় টপ করে গিলে খায়। পেটুক এই পাখি শামুক, গুগলি, জলজ কীটপতঙ্গ খেতে ভালোবাসে।

বাঁশপাতি

শালিক

আমাদের গ্রামগঞ্জের আরেকটা পরিচিত পাখি বাঁশপাতি। সবুজ রঙের এই পাখিটির মাথা লালচে বাদামি। এর বাঁকানো ঠোঁট তীক্ষ্ণ, সুঁচালো। লম্বা বিভক্ত লেজের মাঝে আছে ছোট্ট আরেকটি লেজ। গলায় আছে কালো দাগ। খোলা প্রান্তর আর নির্জন এলাকা এদের পছন্দ। পোকাই এদের প্রধান খাদ্য।

বাংলাদেশে আরও অনেক পাখি আছে। এই পাখিগুলো হলো খঞ্জন, জলময়ূর, ডাহুক, শ্যামা, ধনেশ, পানডুবি, ফিঙে, টিয়া, বাবুই, লাটোরা, গাঙচষা, জলপিপি, সোনালি বেনে বৌ ইত্যাদি। মা বলেন, পাখিরা দারুণ উপকারী প্রাণী। অধিকাংশ পাখি পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিছু কিছু পাখি মৃত পশুর বর্জ্য খেয়ে পরিবেশ-দূষণ থেকে আমাদের বাঁচায়।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে সাম্যর মনে হলো পাখিরাও তো তাহলে মানুষের বন্ধু।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও নিজে নিজে বাক্য তৈরি করি।

নিমীলিত	–	(ঘুমের সময়) চোখ বোজা।
আলস্য	–	কুঁড়েমি, জড়তা।
ঘোষণা	–	কোনো কিছু জানানো, প্রচার করা।
নিশাচর	–	রাতে বিচরণ করে যে প্রাণী।
কৌতূহল	–	নতুন কিছু জানার আগ্রহ।
প্রজাতি	–	নানা ধরনের, নানা জাতের।
বিচরণ	–	বেড়ানো বা ঘোরাফেরা করা।
ভূরিভোজ	–	পেটপুরে খাওয়া।
চমৎকার	–	সুন্দর, মনোহর।
সাবলীল	–	সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি।
কলহপ্রিয়	–	ঝগড়া করতে যে পছন্দ করে।
দুর্বিনীত	–	বিনয়ী বা সংযত নয় যে।
রাজকীয়	–	অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ।
পরাগায়ণ	–	পরাগ ছড়ানো।
পরিবেশ	–	চারপাশের অবস্থা।
নির্জন	–	জনমানুষ নেই যেখানে।
ভারসাম্য	–	দু-দিকের মধ্যে সমতা বজায় থাকা।
বর্জ্য	–	নোংরা দূষিত আবর্জনা।
দূষণ	–	নষ্ট করা।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) পাখিদের ভোরের দূত বলা হয়েছে কেন ?
(খ) জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন ?
(গ) কোন পাখি আমাদের ঘরেরই একজন ? কেন ?
(ঘ) কোন কোন পাখি পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে ? কীভাবে ?
(ঙ) বুলবুলি পাখি দেখতে কেমন ?

৩. ব্যবহার শিখি।

টি, টা, খানা, খানি, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো

টি – পাখিটি দেখতে কী সুন্দর!
টা – চড়ুইয়ের লেজটা সবসময় ঊর্ধ্বমুখী থাকে।
খানা – বইখানা দাও।
খানি – মুখখানি তার ভারি মিষ্টি।
এটি – এটি আমার বই।
ওটি – ওটি কার বই ?
এগুলো – এগুলো পাখির ছবি।
ওগুলো – ওগুলো ধরো না।

৪. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা যেকোনো একটা পাখির কথা বর্ণনা করি।

বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

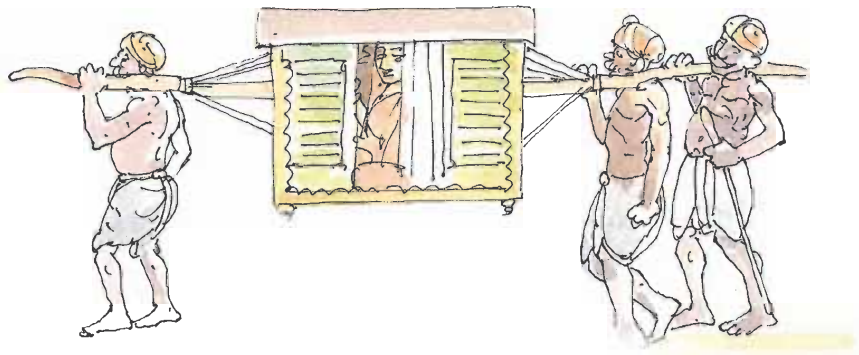

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে, মা, চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে

টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।

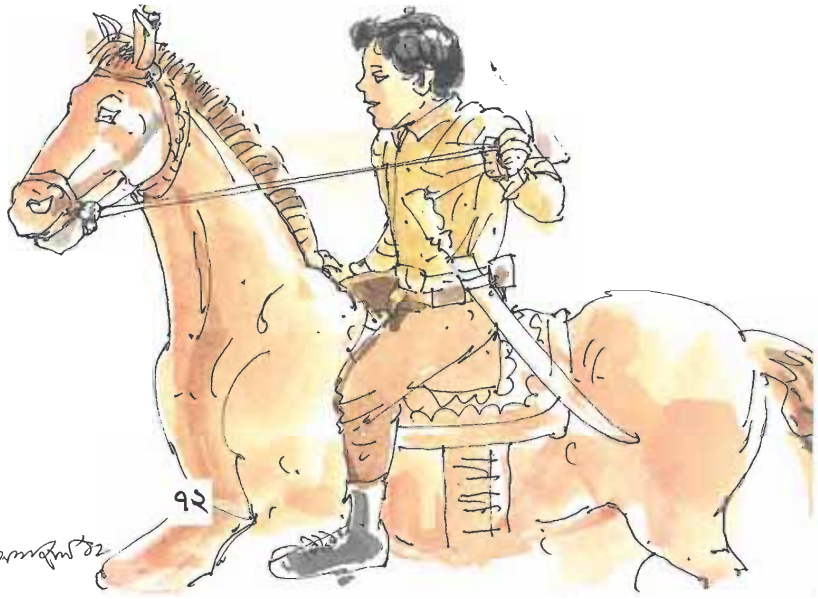

ধূ ধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ-ভাবছ, 'এলেম কোথা।'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে–
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো!'
এমন সময় 'হাঁরে রে রে-রে-রে-রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে?
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!'

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে',
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।

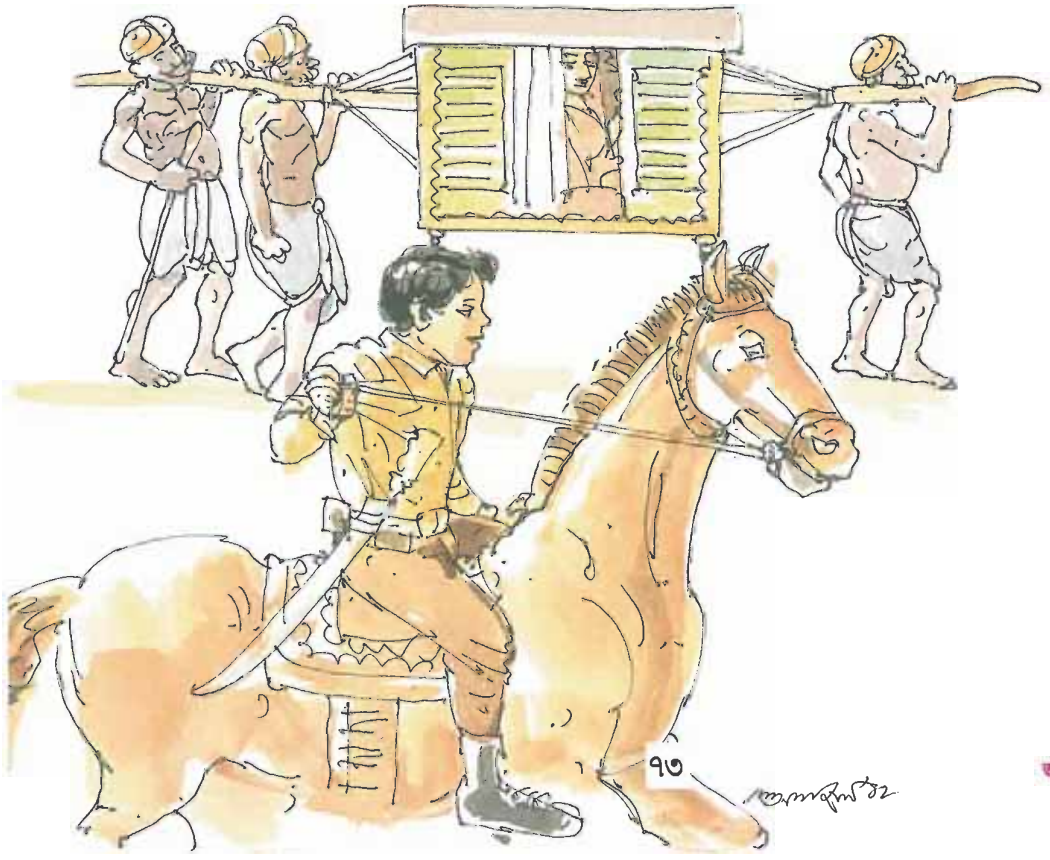

আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে',
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হত তা না হলে!'

(সংক্ষেপিত)

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

ক. শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটি তেমনি এক ছোট্ট শিশুর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবেলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই।

টগবগিয়ে – পানি ফুটবার মতো শব্দ করে, ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ করে। পানি টগবগিয়ে ফুটছে। ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটছে।

রাঙা – রঙিন। পূর্ব আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

পাট – আকাশের পশ্চিম দিকের শেষ ভাগে, অস্তাচল, যেখানে সূর্য ডোবে। 'সূর্য নামে পাটে' (সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে)।

জোড়াদিঘি – যেখানে পাশাপাশি দুটি দিঘি রয়েছে। জোড়াদিঘির পাড়ে মাথা উঁচু করে আছে একটি তালগাছ।

স্মরণ – মনে করা। দূরে গেলে মাকে স্মরণ করি।

বেয়ারা (বেহারা) – যারা কাঁধে পালকি বহন করে। বেয়রাগুলো দুপুর রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

থরোথরো – প্রচণ্ড কম্পন। ডাকাতের ভয়ে গ্রামবাসীরা থরোথরো কাঁপছে।

ঝনঝনিয়ে – ঝনঝন শব্দে। কাঁসার থালাটা মাটিতে পড়ে ঝনঝনিয়ে উঠল।

লড়াই – যুদ্ধ। আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করেছি।

দুর্দশা – খারাপ অবস্থা, কষ্ট। গরিব লোকের দুর্দশার শেষ নেই।

সোঁতা – ক্ষীণ স্রোত বা প্রবাহ। মরা নদীর সোঁতা দূরে মিলিয়ে গেছে।

৩. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

বিদেশ – স্বদেশ
দূরে – কাছে
সকাল – সন্ধ্যা
ভয় – সাহস
আলো – আঁধার, অন্ধকার

৪. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি।

কাটা – অঘ্রাণ মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।
কাঁটা – চোরাকাঁটায় মাঠ ভরে আছে।
কোন – আমার হাতে কোনো কাজ নেই।
কোণ – ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো।
ডাক – তুমি মাকে ভাত খেতে ডাকো।
ডাক – চিঠিটা ডাকে দাও।
ঢাল – ঢাল-তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজ।
ঢাল – পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঝরনা নেমে আসে।

৫. 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'ধূ-ধূ' শব্দ আছে, এ রকম আরও শব্দের ব্যবহার জেনে নিই।

ধূ-ধূ – চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধূ-ধূ করছে।
হু-হু – হু-হু করে হাওয়া বইছে।
সোঁ-সোঁ – সোঁ-সোঁ করে বাতাস ছুটেছে।
ঝনঝন – কাচের আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।
ভনভন – ময়লা জায়গাটায় ভনভন করে মাছি উড়ছে।

৬. প্রশ্নোগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

(ক) খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ?
(খ) মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে ?
(গ) তারা কখন জোড়াদিঘির ঘাটে পৌঁছাল ? এমন সময় কী ঘটল ?
(ঘ) বেয়ারারা কোথায় পালাল ?

(ঙ) 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল' – মা একথা বললেন কেন ?

(চ) বীরপুরুষ কে ? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো ?

৭. কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম তা লিখে জানাই।

কবি পরিচিতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাণ্ডার বিশাল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বহু চিঠিপত্র লিখেছেন। 'বীরপুরুষ' কবিতাটি 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী

সর্দারজি যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব-রুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন একরত্তি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যেটা কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়।

ইতোমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুলুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।' গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার

রাজত্বে পৌঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, নয়টা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছুলাম বা কী করে? এখন চেয়ে দেখি সত্যি নয়টা বেজেছে।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম যে ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ – পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়! হঠাৎ আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গান করতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশ্তুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায় – 'ভালো আছেন তো, মঙ্গাল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?' আমি 'জি হাঁ, জি না' করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতাম। খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসলেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালি তিনি পাঠান, তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না – আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

টাঙ্গা তো চলছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয় – গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায় তাহলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। পরম শ্রদ্ধায় ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান – ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই ?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

আমার বাংলা বই

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি।

স্নানাভাবে – স্নানের অভাবে, গোসল না করতে পারায়।
একরত্তি – একটুকুও।
হোল্ডল – যে বোঁচকার ভিতরে বালিশ বিছানা ভরে বেঁধে রাখা হয়।
দেশলাই – ম্যাচ বাক্স।
তোরঙ্গ – টিনের তৈরি সুটকেস আকারের বাক্স। (সুটকেস চামড়ার তৈরি হয়।)
কন্দুকধারী – যার কাছে কন্দুক রয়েছে, যে ব্যক্তি কন্দুক ধরে রেখেছে।
ঠা-ঠা আলো – এত তেজি আলো যে চোখ মেলে তাকানো যায় না।
বিকল – অকেজো।
শুভলগ্নে – সুসময়ে, শুভ সময়ে।
আলিঙ্গান করা – কোলাকুলি করা।
অবধি – পর্যন্ত।
পশ্তু – বাংলা হিন্দি উর্দুর মতো পাঠান এলাকার একটি ভাষার নাম।
শুধাবেন – জিজ্ঞাসা করবেন।
অভ্যর্থনা – আদর করে ডেকে আনা।
নির্জলা – নির্ভেজাল, খাঁটি।
অফুরন্ত – যা ফুরিয়ে যায় না, যা শেষ হয়ে যায় না।
আর্ত – যে ব্যক্তি বিপদে পড়েছে।
বৃথা – যাতে কাজ দেয় না, কাজ হয় না।
খাস – আসল, প্রকৃত।
ঘোড়ার নালের চাট – ঘোড়ার পায়ের লাথি।
অশ্রদ্ধা – শ্রদ্ধাহীন।
অবজ্ঞা – তাচ্ছিল্য, তুচ্ছতা।
সুচতুর – অত্যন্ত চালাক।
পুঙ্খানুপুঙ্খ – খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

২. নিচের প্রশ্নে উত্তর সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

(ক) সর্দারজি চেনা যায় কী দেখে ?
(খ) দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহর কাদের দখলে থাকে ?
(গ) ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও লম্বা লোকটির নাম কী ?

৩. এগুলো সবই ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ। যেমন – মূল ক্রিয়াপদ – খাওয়া। এই ক্রিয়াপদটি থেকে এই শব্দগুলো হতে পারে ।

যাই : আমার কাজ শেষ। আমি তাহলে বাড়ি যাই ?
যাব : আমি বিকেলে খেলার মাঠে খেলা দেখতে যাব।
যাচ্ছি : আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, খুব খিদে লেগেছে।
গিয়েছি : আমি স্যারের বাসায় গতকালও গিয়েছি।
যেতাম : ছোটবেলায় আমরা গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে যেতাম।

৪. কর্ম-অনুশীলন।

নিজে বেড়িয়ে এসেছো এরকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলি।

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি আলীগড়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাবুল প্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে। ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ঘুরে আসি সোনারগাঁও

পানাম নগর, সোনারগাঁও

জানুয়ারির মাঝামাঝি। শীতের সকাল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্য কেবল উঁকি দিচ্ছে। সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর সবাই এরই মাঝে স্কুলে পৌঁছে গেছে। চারিদিকে সেকি প্রাণের স্পন্দন। বছরের এই সময়টাতেই আয়োজন থাকে শিক্ষাসফরের। যেদিন এই শিক্ষাসফর থাকে,

সাবিহার মনে হয়, স্কুলে যেন উৎসবের ধুম লেগে যায়। আজ কোনো পড়া নেই, আজ ছুটি। আজ মুক্ত জীবনানন্দে শুধুই ঘুরে আসো। এবারকার গন্তব্য ঐতিহাসিক সোনারগাঁও। সোনারগাঁও কথাটা শুনে সাবিহার মনে হয়, সত্যিই কি সোনা দিয়ে জায়গাটি গড়া? নাকি ওখানে সোনা মেলে বলে নাম হয়েছে সোনারগাঁও?

সাবিহা যখন এরকমটা ভাবছে, তখনি হাসান স্যার সবাইকে বাসে উঠে পড়বার তাড়া দিলেন। বেড়াবার আনন্দে সবাই উৎফুল্ল। কিন্তু হাসান স্যারের নির্দেশে কী সুশৃঙ্খলভাবেই–না বাসে উঠছে সবাই। বাসে উঠেই স্যার বললেন, কেউ কি জানো ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব কতখানি? সাবিহার সহপাঠী-বন্ধু নমিতা, সেই উত্তর দিল – ২৭ কিলোমিটার। ঠিক বলেছ। হাসান স্যার আরও জানালেন, ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় সোনারগাঁওয়ের অবস্থান। আমাদের বাসটা এখন সেদিকেই চলেছে। এরই মধ্যে গুলিস্তানকে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। সামনে যাত্রাবাড়ি। এরপর আমরা ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক ধরে কাচপুর ব্রিজ পেরুলেই সোনারগাঁও।

বাসের জানালা দিয়ে সাবিহার চোখ গেল বাইরে। মনে হলো শহরটা যেন আড়মোড়া ভেঙে সবে জেগে উঠছে। মানুষজন এরই মাঝে রাস্তায় চলাচল শুরু করে দিয়েছে। বাস আর ট্যাক্সির শব্দে সরগরম হয়ে উঠছে চারাপাশ। হাসান স্যারই বললেন, আমরা যাত্রাবাড়িও ছাড়িয়ে এলাম। এবার চলেছি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মগরা। মগরার কাছেই সোনারগাঁও।

বাস থেকে নেমে সোনারগাঁওয়ের মাটিতে পা রাখতেই সাবিহার মনটা খুশিতে চন্‌মন্‌ করে উঠল। শীতের কী সুন্দর মিষ্টি রোদ্দুর। সবুজের কী চমৎকার সমারোহ। চোখে পড়ল এক-গম্বুজ বিশিষ্ট একটা মসজিদের ওপর। হাসান স্যারই বললেন, এটি হচ্ছে গোয়ালদি মসজিদ। মুঘলরা বঙ্গাদেশে আসার আগে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করা হয়। মুঘল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন হিসেবে এটি এখনো টিকে আছে।

ঐতিহাসিক স্থান সোনারগাঁও, তার ইতিহাসটা তোমাদের বলছি। হাসান স্যার সংক্ষেপে জানালেন, প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর সুবর্ণগ্রাম। পরে এর নাম হয় সোনারগাঁও। ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী। ঈশা খাঁ ছিলেন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা। এবার চলো, সোনারগাঁয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগরটা দেখে আসি। নগরের মধ্যে আরেক নগর! সাবিহার ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।

আমার বাংলা বই

লোকশিল্প যাদুঘর, সোনারগাঁও

একটা মাত্র রাস্তা। তার দুই পাশে সারি সারি অনেকগুলো প্রাচীন দালান। দালানগুলো খুব উঁচু নয়। সবগুলোই দোতলা। প্রায় একশো বছরেরও আগের তৈরি। এখানেই ধনী ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন। সোনারগাঁও তখন ছিল কাপড় তৈরির প্রসিদ্ধ স্থান। বিরাট এক বাণিজ্যিক শহর। সোনারগাঁওয়ের তৈরি মসলিনের ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। পরে সুতি কাপড়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এটি। কিন্তু একসময় এদেশে বিলিতি কাপড় এসে পৌঁছালে, দেশি কাপড়ের কদর যায় কমে। বন্ধ হয়ে যায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য। দালানগুলোর এখন তাই কী জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। তবে অভূতপূর্ব এর স্থাপত্যশৈলী। কী সূক্ষ্ম আর দৃষ্টিনন্দন কাজ। আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে যেন সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সাবিহার মনে হলো, এ যেন সেই রহস্যময়ী নগরী যার ভিতরে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করবে না। কিন্তু হাসান স্যারের কথায় আবার তার সংবিৎ ফিরে এলো, চলো, এবার আমাদের শেষ গন্তব্য সোনারগাঁও লোকশিল্প যাদুঘর দেখে আসি।

যাদুঘর! যাদুঘরই হচ্ছে আসল রহস্যপুরী। এর ভিতরেই স্তব্ধ হয়ে থাকে কাল-মহাকাল। একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন যাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে। সোনারগাঁয়ের যাদুঘরে ঢুকতে ঢুকতে সবুজের স্নিগ্ধ স্পর্শে সাবিহার মনটা ভরে গেল। কী চমৎকার একটা লেক, শান্ত পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।

শখের হাঁড়ি

প্রথমেই সবাই ঢুকে পড়ল লোকশিল্প যাদুঘরে। যে বাড়িতে যাদুঘরটা করা হয়েছে তার আদি নাম বড় সর্দারবাড়ি। দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশপথ। কত্তো জিনিস যে আছে দেখবার, শিখবার। যাদুঘরটা সাধারণ যাদুঘর নয়, লোকশিল্পের যাদুঘর। আমাদের গ্রামীণ মানুষের তৈরি জিনিসপত্রকে বলে লোকশিল্প। হাসান স্যারই কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি দেখে সত্যি বিস্মিত সাবিহা। বাংলাদেশের মানুষ কত জিনিসই–না কত সুন্দর করে তৈরি করতে জানে। কত বিচিত্র জিনিস আমরা ব্যবহার করি। কী সুন্দর জামদানি শাড়ি আর কী বাহার ওই নকশি কাঁথার। যে দেশের মানুষের মন সুন্দর, রুচিবোধ আছে, তারাই এমন জিনিস তৈরি

করতে পারে। শিল্পী জয়নুল আবেদীনের সংগ্রহশালায় গিয়ে আরও মুগ্ধ সাবিহা। সত্যি, কত বড় শিল্পী তিনি। কী চমৎকার ছবি তাঁর। বাংলাদেশকেও ভালোবাসতেন খুব। ভালোবাসতেন এদেশের মানুষকে। তিনিই তো এই যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। সাবিহাদের বাস ফিরে আসছে ঢাকায়। বাসের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে সাবিহার মনে হলো, কী সুন্দর একটা যাদুঘর ঘুরে এলাম। এখানেই যেন বাঙ্ময় হয়ে আছে গ্রামীণ বাংলাদেশ। আমাদের সত্যিকারের বাংলাদেশ।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

আবরণ	–	আচ্ছাদন।
স্পন্দন	–	কম্পন, কেঁপে কেঁপে ওঠা।
শিক্ষাসফর	–	শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে যে সফর করা হয়।
উৎসব	–	আনন্দ অনুষ্ঠান।
ধুম	–	আনন্দিত অবস্থা।
জীবনানন্দ	–	জীবনের আনন্দ।
গন্তব্য	–	যাত্রার শেষে যেখানে পৌঁছায় মানুষ।
ঐতিহাসিক	–	ইতিহাস সংক্রান্ত।
উৎফুল্ল	–	হাসিখুশি অবস্থা।
আড়মোড়া	–	আলস্য ত্যাগ।
সরগরম	–	ব্যস্ত অবস্থা, সাড়া পড়ে যাওয়া।
মহাসড়ক	–	বড় দীর্ঘ রাস্তা।
চন্‌মন্‌	–	চাঙ্গা ভাব।
সমারোহ	–	একত্রিত হওয়া, জড়ো হওয়া।
সুবর্ণ	–	একধরনের ধাতু, সোনা।
গম্বুজ	–	চূড়া।
বঙ্গাদেশ	–	বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের অবিভক্ত বাংলা অঞ্চল।
স্থাপত্য	–	ভবনকেন্দ্রিক শিল্পকর্ম।

নিদর্শন – দৃষ্টান্ত।
শাসনকর্তা – প্রধান শাসক।
অঞ্চল – এলাকা।
সমৃদ্ধ – উন্নত।
প্রসিদ্ধ – বিখ্যাত।
বাণিজ্যিক – বাণিজ্য সংক্রান্ত।
মসলিন – বিখ্যাত বস্ত্র, একসময় বাংলাদেশে তৈরি হতো।
বিলিতি – বিলাত বা ইংল্যান্ডের কোনো কিছু।
জীর্ণশীর্ণ – ক্ষীণকায়, খারাপ অবস্থা।
অভূতপূর্ব – পূর্বে যা দেখা যায়নি বা ঘটেনি।
সূক্ষ্ম – নিপুণ, সুন্দর।

২. সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) সোনারগাঁও কোথায় অবস্থিত ?
(খ) গোয়ালদি মসজিদ কী জন্যে বিখ্যাত ?
(গ) পানাম নগর কী জন্য প্রসিদ্ধ ?
(ঘ) লোকশিল্প কাকে বলে ?
(ঙ) যাদুঘর কাকে বলে ?
(চ) বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষ কী কী ধরনের জিনিস তৈরি করে ?
(ছ) সোনারগাঁও লোকশিল্প যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৩. একই অর্থ দেয় এরকম কয়েকটি শব্দ লিখি।

ফুল – পুষ্প, কুসুম, মঞ্জরী, প্রসূন, পুষ্পক
পানি – জল, বারি, সলিল, নীর, অম্বু
পৃথিবী – জগৎ, ধরণী, ধরিত্রি, ভুবন, বসুন্ধরা
নদী – তটিনী, গাঙ, প্রবাহিণী, শৈবলিনী, কল্লোলিনী
পতাকা – কেতন, ঝান্ডা, নিশান, বৈজয়ন্তী, ধ্বজা

৪. আমার নিজের গ্রাম বা শহরের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

যেখানেতে দেখি যাহা
মা–এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।
হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোন কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক –
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা–র পিছু পিছু !

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা ?'
পড়া লেখা ভালো হলে
দেখেছ সে কত ছলে

ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে !
বলে, ‘মোর খোকামণি।
হীরা–মাণিকের খনি,
এমনটি নাই কারো !’ শুনে বুক ভরে !

দিবানিশি ভাবনা
কিসের ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা–র
ছেলেরি গরবে তার
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

ক. আমাদের সবার জীবনে ‘মা’ কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দার্থ জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

মতন – মতো, অনুরূপ।
সুধা – আদর।
হেরিলে – দেখিলে।
পরান – প্রাণ।
যাতনা – কষ্ট।
নিনু – নিলাম।
ছিনু – ছিলাম।
বাক – কথা, শব্দ।
শুধাবেন – জিজ্ঞাসা করবেন, জানতে চাইবেন।
সোহাগ – অমৃত, মধু।

৩. কবিতার একটি চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,
_____
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
_____
সকল যাতনা ভোলে
_____

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৫. কবিতাটির প্রথম আটটি চরণ মুখস্থ বলি।

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৭. আমার 'মা' সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি।

কবি পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী। তিনি 'নবযুগ' ও 'ধুমকেতু' সহ আরও অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "মা" কবিতাটি 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমার বাংলা বই

পাহাড়পুর

চারদিকে পাহাড়-টাহাড় নেই, কিন্তু জায়গার নাম পাহাড়পুর। জায়গাটার নাম তোমরা শুনে থাকবে হয়তো। কেউ হয়তো কাগজে বা টিভিতে এর ছবি দেখে থাকবে। তোমার মনে হতে পারে পাহাড় ছাড়া কীভাবে হলো পাহাড়পুর ? এটি বাংলাদেশের এমনকি দুনিয়ার একটি বিখ্যাত জায়গা। কিন্তু এর সম্পর্কে সবাই খুব ভালো জানে না। তোমরা জান কি যে পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার ?

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

আসলে বৌদ্ধবিহার কী ? প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুগণ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় থাকতেন। সেখানে থেকে তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিতেন। এরকম 'বিহার' অনেক জায়গায় আছে। বাংলাদেশের বাইরে এবং ভিতরে আরও বিহার আছে, যেমন কুমিল্লার ময়নামতির 'শালবন বিহার'। কিন্তু হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত কোনো স্থানে পাহাড়পুরের মতো বড় বিহার আর নেই। প্রায় ১৪শ বৎসর আগে এটি

তৈরি করা হয়। কিন্তু একসময় এটি খালি পড়ে থাকে। অনেকে মনে করেন যুগযুগ ধরে উড়ে-আসা ধুলাবালি ও মাটি এটির চারদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তূপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। এটির আরেক নাম 'সোমপুর বিহার' বা 'সোমপুর মহাবিহার'।

এই বিহারটি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। নওগাঁ থেকে বাসে করে গেলে ৩৪ কি. মি., কিন্তু বদলগাছি থানা সদর থেকে ১৬ কি.মি। আর পাশের জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে গেলে মাত্র ৫ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয়। বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির উপর এর বিশাল দালান। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৯২২ ফুট আর পূব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল প্রায় ১২শ বছর আগে এটি নির্মাণ করান।

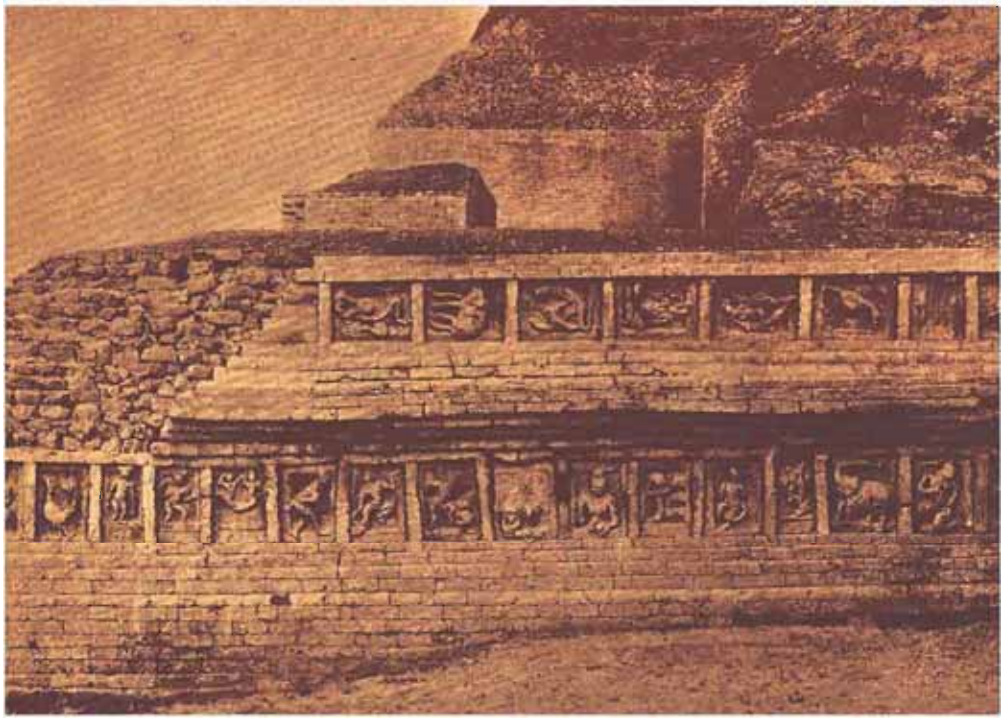

পাহাড়পুর বিহারের পোড়া মাটির ফলক

আমার বাংলা বই

একদম নিচে মাটির অংশে এটি চারকোনা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানান রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তারপরেই বড় হলঘর। পাশে দুটি ছোট হলঘর। চারদিকের দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সার বাঁধা ১৭৭টি ছোট ছোট ঘর। সামনে দিয়ে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আছে পুকুর, স্নানঘাট, কূপ, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর টয়লেট। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষার এই প্রাণকেন্দ্রে ভিক্ষুদের সঙ্গে শিষ্যরা থাকত।

ভেতরটায় বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে বড় মন্দিরটা বসানো হয়েছে। এখানেও পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটছোট মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। ওটাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাবতীর ঘাট'।

পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা যাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র।

এই এলাকার একটু দূরেই আছে 'সত্যপীরের ভিটা'। সেখানে অনেকেই ভক্তিভরে প্রার্থনা করে, মানত করে। কারো মনের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে ওখানে আবার যায়। ওটা আসলে বৌদ্ধ মন্দির ছিল নাকি অন্য কিছু, আজকে তা আর বোঝার উপায় নেই।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই এবং নিজে নিজে বাক্য রচনা করি।

সুপ্রাচীন	–	পুরাতন (পুরনো), বহুকাল আগের।
ভিক্ষু	–	বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী (যাঁরা সংসার করেন না); তাঁদের পরনে থাকে কাষাই (গেরুয়া) রঙের লম্বা কাপড়, মাথা থাকে মুড়ানো এবং চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুতেই থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য।
স্তূপ	–	ঢিবি, ঢিবির মতো বৌদ্ধদের সমাধি।
বিশাল	–	অনেক বড়, প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ।
প্রাণকেন্দ্র	–	প্রধান জায়গা।

দুর্লভ – যা সহজে লাভ করা যায় না বা পাওয়া যায় না।
মানত – কারো মনের ইচ্ছা পূরণ হলে সৃষ্টিকর্তা উদ্দেশ্য করে কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা।

২. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন ——————————।
(খ) ——————————সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন।
(গ) এই বিহারটি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার——————————উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত।
(ঘ) রাজা ——————————প্রায় ১২শ বছর আগে থেকে এটি নির্মাণ করান।
(ঙ) সব মিলিয়ে বিহারটিতে ——————————বৌদ্ধভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা ছিল।
(চ) এই এলাকার একটু দূরেই আছে ——————————।

৩. সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) পাহাড়পুর কী জন্য বিখ্যাত ?
(খ) এখানে কত বছর আগে কারা থাকত ?
(গ) বিহারটির মাঝখানে কী আছে ?
(ঘ) বৌদ্ধ বিহারটির মাটি এবং দেয়াল কোন রঙের ?
(ঙ) পাহাড়পুর বিহারের পাশে দেখার মতো আর একটা কী আছে ? সেখানে কী কী দেখা যায় ?

৪. কথাগুলো বুঝে নিই।

পাহাড়-টাহাড় – পাহাড় আর তার আশে পাশে পাহাড়ের মতো আরও কিছু। বাংলায় এরকম আরও বলা হয় ''আমাকে চা-টা কিছু খেতে দাও।"
উড়ে-আসা – বাতাসের সঙ্গে যা কিছু উড়ে আসতে পারে তাকে বলে 'উড়ে–আসা', যেমন উড়ে-আসা গাছের পাতা, উড়ে-আসা পাখি ইত্যাদি।
পাড়ি দেওয়া – এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছানো বা পার হওয়াকে বলা হয় 'পাড়ি দেওয়া'। যেমন– সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সবার কাজ নয়।

৫. নিচের ছবি দেখি ও সে সম্পর্কে বলি।

(ক)

(খ)

(ঘ)

৬. কর্ম-অনুশীলন।

এই পাঠে যেসব স্থান ও ব্যক্তির নাম আছে সেই সব নামের একটা তালিকা তৈরি করি। আমার তালিকাটি পাশের বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

লিপির গল্প

শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলব। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।

মনজুলা : স্যার, আমারও গল্প বানাতে ভালো লাগে।

শিক্ষক : খুব ভালো। গল্প বানাতে হলে কিন্তু গল্প শুনতে হবে, গল্প পড়তে হবে, গল্প লিখতেও হবে।

রাজা গণেশের আমলে মুদ্রায় বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলের পাথরে খোদিত বাংলা লেখা

আলো : আচ্ছা, এখন আমরা গল্প শুনব। কিন্তু কোন গল্প? রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, বেজ্ঞামা-বেজ্ঞামীর গল্প, নাকি সুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প?

শিক্ষক : তোমরা অনেক গল্প জান। আজ একটা গল্প বলব। লিপির গল্প।

অনজু : লিপির গল্প! শুনিনি তো কোনো দিন!

শিক্ষক : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিন্তা করে মনের কথা লেখা। এই লেখা কেমন করে মানুষ পেল, কেমন করে আবিষ্কার করল, কেমন করে অভ্যাস করল – তাই বলব। লিপির গল্প মানে লেখার ইতিহাস।

হাসান : মজা তো!

শিক্ষক : অনেক দিন আগের কথা। একশ, দুশ বছর নয়, এক হাজার দুহাজার বছর নয়, প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতেও জানত না, পড়তেও জানত না। জানবে কী করে? তখন তো বর্ণ বা অক্ষর কিছুই ছিল না।

আদিত্য : অ্যাঁ, বর্ণমালাও ছিল না? অক্ষরও ছিল না, মানে অ আ ক খ কিছুই ছিল না।

শিক্ষক : সত্যিই কোনো ভাষার কোনো বর্ণমালা, অর্থাৎ অক্ষর বা হরফ কিছুই ছিল না। তখন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না, সাক্ষর লোক ছিল না।

আমিনা : তাহলে তারা চিঠি লিখতো কী করে?

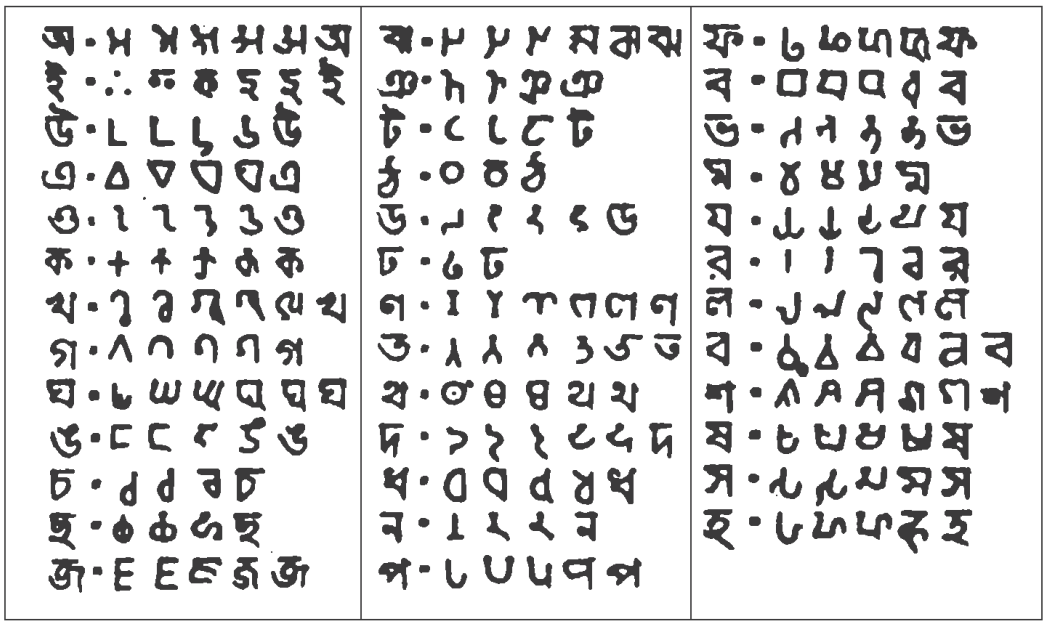

বাংলা বর্ণের ক্রমবিকাশ

শিক্ষক : তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি কলম ছিল না। আমাদের বাবা, মা, দাদি ছোটদের জন্য গল্প বানাতেন আর পাহাড়ের গুহায় বসে রাতে চাঁদের আলোতে গল্প বানিয়ে বানিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন। বড়রা গল্প বলতেন আর ছোটরা গল্প শুনত। গল্প শুনে শুনে বড় হয়ে নিজেরা আবার ছোটদের গল্প শোনাত।

সুজিত : আচ্ছা, ভুলে গেলে কী করত?

শিক্ষক : খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেলে তখন আর গল্পটা বলতে পারত না। আবার নতুন করে নতুন গল্প বানাতে হতো। সে জন্যেই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এল। শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দিই হলো লিপি।

নাহিদ : এখন যেমন কথাবার্তা, গানবাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ক্যাসেটে ধরে রাখা হয় সে রকম?

শিক্ষক : ঠিক বলেছ, অনেকটা তাই। এখন যন্ত্রের বাক্সে কথাকে বন্দি করে রাখা হয়, তখন হাতে আঁকা রেখায় কথাকে বন্দি করে রাখা হতো। কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করে রাখার জন্যই তৈরি হলো লিপি। লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি, কেউ বলেন বর্ণমালা, কেউ বলেন হরফ, কেউ বলেন অক্ষর, কেউ বলেন 'অ্যালফাবেট'। মানুষ যেদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

হাসান : লিপি আবিষ্কার করলেন কে?

শিক্ষক : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে কখন কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না। আধুনিক কালে যাঁরা এ ধরনের কাজ করেছেন তাঁদের কারও কারও নাম জানা যায়। যেমন, কোরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের এক ধর্মযাজক সন্ত সিরিল।

টমাস : বাংলা লিপি কীভাবে এল?

শিক্ষক : বাংলা লিপি কে প্রচলন করেছেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গালিপি রূপান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই বঙ্গালিপিই বাংলা লিপির পুরানো নাম।

শিউলি : স্যার, পৃথিবীতে কত লিপি ছিল?

আমার বাংলা বই

শিক্ষক : কত লিপি ছিল তা সঠিক কেউ জানে না। তবে অনেক লিপি কালে কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক লিপির নমুনা পাওয়া গেছে, যেমন : মহেঞ্জোদারোর লিপি, মিশরীয় লিপি। তবে এগুলোর পাঠ উদ্ধারের জন্য এখনও ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরও গবেষণা করছেন। তোমরা বড় হয়ে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পারবে।

সকলেই : স্যার, আপনার মুখে লিপির কথা শোনার পর আমাদের আরও জানতে ইচ্ছে করছে। বড় হয়ে আমরা লিপি সম্পর্কে আরও জানতে চাই।

(২০১২ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণির 'আমার বাংলা বই' থেকে গৃহীত)

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

লিপির গল্পটি ভাষার প্রতীকচিহ্ন হিসেবে বর্ণমালা কীভাবে আস্তে আস্তে একটি রূপ পায়। তার একটি ধারণা কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

২. শব্দার্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি।

আবিষ্কার – উদ্ভাবন, নতুন কিছু তৈরি। মানুষ কালে কালে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে।
অভ্যাস – স্বভাব। চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস।
সাক্ষর – অক্ষরজ্ঞান, বর্ণ চেনে এমন। সাক্ষর লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
বন্ধন – বাঁধন। মানুষের সাথে মানুষের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক।
বঙ্গালিপি – বাংলা ভাষার অক্ষর, বর্ণ বা হরফ। বাংলা লিপির পুরানো নাম বঙ্গালিপি।
রূপান্তর – পরিবর্তন। বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর কর।

৩. বাক্য রচনা করি।

গল্প, শিক্ষক, আনন্দ, চিন্তা, আবিষ্কার, বর্ণমালা, সাক্ষর, প্রাচীন, লিপি।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

তুমি খুব ——— প্রশ্ন ———।
ভুলে গেলে ——— হয়ে যেতো।
গল্পটা ——— না।
আবার নতুন করে নতুন ——— বানাতে হতো।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) লিপি বলতে কী বুঝি তা বলি ও লিখি।
(খ) লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে ?
(গ) লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।
(ঘ) বাংলা লিপি কীভাবে এলো ?
(ঙ) লিপির গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

নাটিকাটি শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয় করি।

সমাপ্ত

আমার বাংলা বই